বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে

'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ'-এর গ্রন্থাগারে সংগ্রহে রাখার জন্য
শ্রী সুকুমার বেরা
18.02.2003

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে
শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

❖

প্রকাশ কাল
প্রথম সংস্করণ
আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ২৫২০ বুদ্ধাব্দ
১৩৮৩ বাংলা, ১৯৭৬ ইংরেজী

দ্বিতীয় সংস্করণ
বৈশাখী পূর্ণিমা ২৫৪১ বুদ্ধাব্দ
১৪০৪ বাংলা, ১৯৯৭ ইংরেজী

❖

মুদ্রণে
ময়নামতি আর্ট প্রেস
কোরবাণীগঞ্জ, চট্টগ্রাম
(বলুয়ারদীঘি পশ্চিম পাড়)
ফোন ঃ ৬১৪৭৯৬

❖

প্রাপ্তি স্থান
বিশ্বশান্তি প্যাগোডা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

❖

মূল্য ঃ পনের টাকা মাত্র
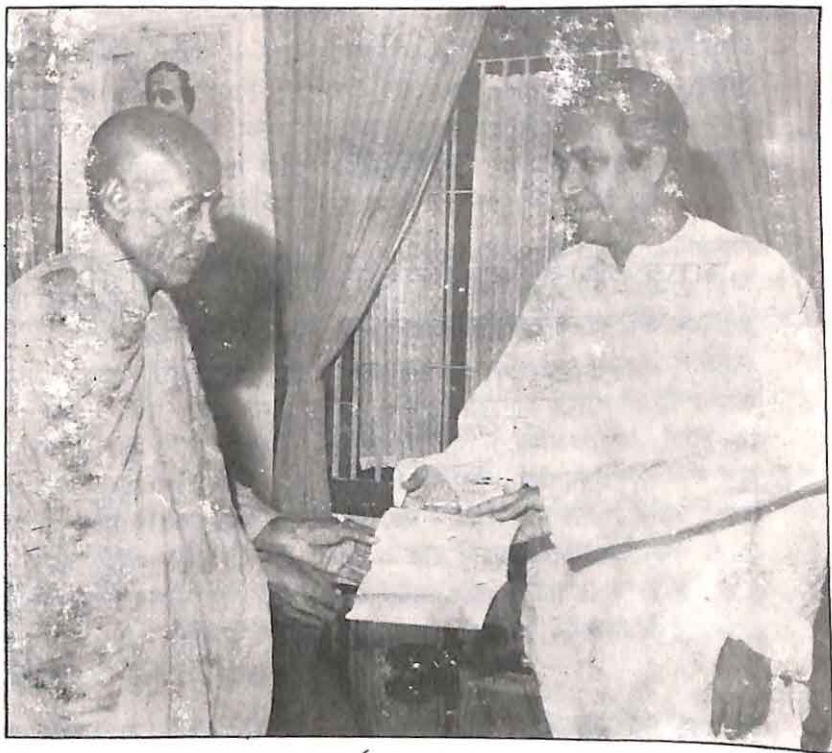
১৯৭৪ সনে বাংলাদেশ বন্যা দুর্গত এলাকায় সাহায্যের জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে থাইল্যাণ্ড থেকে প্রাপ্ত ২০০০ US$ (দুই হাজার ডলার) বঙ্গবন্ধুকে হস্তান্তর করেন শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের।

উৎসর্গ

মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা
জীবনাহুতি প্রদান করেছেন,
সেই লাখ লাখ শহীদের
রক্তাক্ত স্মৃতির
উদ্দেশ্যে-

অধ্যাপক আবুল ফজল
সদস্য, রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদ
নং-১৯৩ (এম,আই) ৭৬

শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী গবেষণা
এবং আনবিক শক্তি শ্রম ও সমাজ-কল্যাণ
এবং সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

তারিখ ঃ ৫-৭-৭৬ ইং

পরিচিতি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উপজীব্য করে বাংলায় ও ইংরেজীতে বেশ কয়েকটি বই লেখা হয়েছে। যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কেউ প্রত্যক্ষদর্শী, আর কেউ বা প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামে ছিলেন জড়িত। যাঁরা কোনো না কোনোভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সক্রিয় অংশ নিয়েছেন তাঁদের বর্ণনায় অবশ্য ব্যক্তিগত ছাপ থাকাটা স্বাভাবিক। তবু এ ধরণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে লিখিত বইয়েরও ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে।

মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথেরো বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা পন্ডিত ও নিষ্ঠাবান সমাজকর্মী। বাংলাদেশের বৌদ্ধদের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে তিনি আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে মহান ভূমিকা পালন করেছিলেন তা ছিল একদিকে মিথ্যার সাথে আপোষহীন, অন্য দিকে ছিল অত্যাচার নিপীড়ণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর। মহামানব গৌতম বুদ্ধের সাম্য-মৈত্রী-করুণা ও অহিংসার আদর্শে নিবেদিত-প্রাণ গৈরিকবসনধারী এই বৌদ্ধ ভিক্ষুর মুক্তি সংগ্রামকালীন কর্মতৎপরতা, বিশেষতঃ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত থেকে শুরু করে শ্রীলংকা, থাইল্যাণ্ড, জাপান প্রভৃতি দক্ষিণপূর্ব এশীয় বৌদ্ধ প্রধান দেশগুলোতে ব্যাপক সফরের মাধ্যমে হানাদার বাহিনীর নৃশংস নির্যাতন ও গণহত্যার সঠিক বিবরণ প্রচার ও তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জ্ঞাপন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে প্রভূত সহায়তা করেছিল। তাই মাননীয় জ্যোতিঃপাল স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই দুঃসহ ভয়াবহ দিনগুলিতে বিবেকের কণ্ঠস্বর হিসেবে দেশ-বিদেশে খ্যাত ও স্বীকৃত হয়েছিলেন।

'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে' বইটি মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথেরোর স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন তাঁর ব্যক্তিগত সক্রিয় ভূমিকার অভিজ্ঞতা প্রসূত ফসল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সামগ্রিক ইতিহাসে বইটি মূল্যবান সংযোজন হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি। বইটির ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল। মাননীয় মাহথেরো ইতিপূর্বে ধর্মীয় ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত মূলক কয়েকটি বই লিখেছেন এবং সেগুলি সুধী মহলে প্রশংসা অর্জন করেছে। আশা করি, তাঁর এ বইটিও অনুরূপভাবে প্রশংসিত হয়ে সকল শ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করবে। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

আবুল ফজল

প্রথম সংস্করণে লেখকের বক্তব্য

অবশেষে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে 'বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে' মুদ্রণালয় থেকে আত্ম প্রকাশের সুযোগ পেল। ১৯৭১ সালের সেই সংগ্রাম দীপ্ত দিনগুলো বাংলাদেশের প্রতিটি নর-নারীর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে রয়েছে। তার বিস্তারিত বিবরণ আমি দিতে পরিনি এবং সেই অবকাশ আমার ছিল না। মাতৃভূমি স্বদেশকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালবাসি। তাই তার লাঞ্ছনা আমাকে অন্যান্য দেম-প্রেমিকদের মত স্বভাবতঃ ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। অন্যায়ের সাথে জুলুমের সাথে আমি আপোষ করিনি, অন্ততঃ ধর্মের দোহাই দিয়ে অত্যাচারী পাপিষ্ঠদের দোসর সেজে বাঁচার চেষ্টা চালাইনি। বরং দৃঢ়তার সাথে স্বদেশের মুক্তির জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। আমার সেই সংগ্রাম তথাগত বুদ্ধ নির্দেশিত অহিংসার পথে– যতটুকু পেয়েছি ততটুকু করেছি।

আমার সান্ত্বনা, আমাদের সংগ্রাম সফল হয়েছে। মাতৃভূমি স্বদেশ মুক্তির আলোক দেখতে পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে এবং সেখান থেকে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধদেশ গুলোতে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সপক্ষে এবং হানাদার বাহিনীর নৃশংস অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গঠনে যে সক্রিয় প্রচার অভিযান চালিয়েছি তার ধারাবাহিক বিবরণ এই গ্রন্থের উপজীব্য। আমার এই বিবরণ খণ্ডিত হলেও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সামগ্রিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে সংযোজিত হবার দাবী রাখে।

এই গ্রন্থটি প্রকৃত প্রস্তাবে ১৯৭৪ সালেই মুদ্রণালয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু নানা করণে, বিশেষতঃ আর্থিক দুরাবস্থায় তা সম্পূর্ণ মুদ্রিত হওয়া সত্বেও প্রকাশনায় বিঘ্ন ঘটে। শেষ পর্যন্ত প্রকাশনার যাবতীয় ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলেন রাউজানের বিশিষ্ট প্রবীন শিক্ষাবিদ শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়ার সুযোগ্য পুত্র খ্যাতিমান প্রকৌশলী শ্রী কমলাংশু বড়ুয়া। তিনি আবার আমাদের সংঘের চট্টগ্রাম শাখার কোষাধ্যক্ষ। তাঁর লোকান্তরিতা মাতৃদেবী নীলিমা বড়ুয়ার পুণ্যস্মৃতির প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থটির প্রকাশনায় ব্রতী হন। তাঁর এ ধরনের আগ্রহ ও উদারতা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সর্বাঙ্গীন কুশল ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক, জ্ঞানতাপস চিন্তাবিদ অধ্যাপক আবুল ফজল সাহেব এ গ্রন্থটির মূল্যবান ভূমিকা বা পরিচিতি লিখে দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। তাঁর অপরিসীম কর্মব্যস্ততার মধ্যে আমার জন্য কষ্ট স্বীকারের যে সহৃদয় পরিচয় তিনি দিয়েছেন তজ্জন্য বাস্তবিক আমি আনন্দ ও গৌরববোধ করছি। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই।

গ্রন্থটি প্রকাশনার ব্যাপারে আমাদের সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্মসাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক শ্রী বিমলেন্দু বড়ুয়া পাণ্ডুলিপি পাঠ ও সংশোধন, মুদ্রণ প্রুফ দেখা এবং অন্যান্য যাবতীয় যোগাযোগ কার্যাদি অশেষ পরিশ্রম সহকারে সম্পাদন করেছেন। সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রথিতযশা সাংবাদিক ও সমাজকর্মী শ্রী ডি,পি, বড়ুয়া গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখে দিয়েছেন এবং তা যথাসত্বর প্রকাশের জন্য আমাকে বারবার উৎসাহিত করেছেন। তাছাড়া সংঘের সহ-সভাপতি বিশিষ্ট বাগ্মী দর্শনসাগর শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাথেরো, সহ-সভাপতি প্রবীন সমাজকর্মী শ্রী সুরথ চন্দ্র বড়ুয়া, শ্রী নিকুঞ্জ বিহারী বড়ুয়া, সংঘের চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি প্রবীন সমাজসেবী শ্রী বিভূতি ভূষণ বড়ুয়া, অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রী সরিৎ কান্তি বড়ুয়া, শ্রী প্রফুল্ল কুমার বড়ুয়া, সম্পাদক তরুণ সমাজকর্মী বিশিষ্ট প্রকৌশলী শ্রী ব্রহ্মদত্ত বড়ুয়া সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী শচীন্দ্র লাল বড়ুয়া, শ্রীমৎ ধর্ম পাল মহাথেরো, বনশ্রী থেরো, অমৃতানন্দ থেরো, রতনশ্রী ভিক্ষু, সংঘের কুমিল্লা শাখার সভাপতি শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ মহাথেরো, সম্পাদক শ্রী আশুতোষ সিংহ, শ্রী বীরসেন সিংহ প্রমুখ কর্মকর্তা মণ্ডলী আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশনার গুরুত্ব সম্পর্কে সর্বদা তাগাদা দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি নিছক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি সেই মহানুভবতাকে ক্ষুণ্ন করতে চাই না।

গ্রন্থটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন খ্যাতনামা শিল্পী শ্রী অমিত চন্দ। তাঁর সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন বিশিষ্ট ছাত্র-কর্মী শ্রীসুভাষ চৌধুরী। তা'ছাড়া, মুদ্রণ পরিপাঠ্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মিন্টো প্রেসের শ্রী সুনীল কান্তি বড়ুয়া, শ্রী অনিল কান্তি বড়ুয়া, শ্রী দুলাল কান্তি বড়ুয়া প্রমুখ মালিক, কর্মাধ্যক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দ যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের সবাইকে আমি আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্বেও গ্রন্থটি প্রয়োজনীয় ফটো ইত্যাদি দিয়ে শোভন সমৃদ্ধ করে প্রকাশ করতে পারিনি। অর্থাভাবই তার মূল কারণ। যা হোক, যথেষ্ট দেরীতে হলেও গ্রন্থটি আমার দেশের ভাবীকালের নাগরিকদের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে প্রকাশ করতে পেরে আমি কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছি। এটা থেকে কেউ শিক্ষা পেলে, অনুপ্রাণিত হলে নিজের শ্রম সার্থক মনে করবো। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

বরইগাঁও, লাকসাম
কুমিল্লা, বাংলাদেশ।
আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ১৩৮৩ বাংলা
২৫২০ বুদ্ধাব্দ
জুলাই, ১৯৭৬ ইংরেজী।

দ্বিতীয় সংস্করণে লেখকের বক্তব্য

আমার "বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে" পুস্তকটির নামকরণ দেখলে মনে হয় যেন রাজনীতি সম্বলিত বিশদ বর্ণনা দিয়ে লিখিত একটি পুস্তক। ইহা রাজনীতি সম্পর্কিত রাজনৈতিক পুরুষের আলোচনায় ভরপুর। বস্তুতঃ তা নয়। যেহেতু আমি রাজনীতিজ্ঞ নই। রাজনীতি আমার সম্পূর্ণ অনধিগম্য। তথাপি সচেতন ব্যক্তি মাত্রই মাতৃভূমি স্বদেশেকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসায় অভিভূত হওয়া স্বাভাবিক। মাতৃভূমির প্রতি নিদারুন লাঞ্ছনা অন্যান্য দেশ-প্রেমিক ও দেশাত্ববোধ পরায়ণ ব্যক্তির মত আমাকেও অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ করে বসেছিল ১৯৭১ সনে। অন্যায় অত্যাচার সহ্য করতে পারিনি। নিরীহ জনগণের প্রতি জুলুম অবিচারের সাথে আপোষ করিনি। ধর্মের দোহাই দিয়ে অত্যাচারী পাপিষ্ঠদের দোসর সেজে বাঁচার চেষ্টা চালাইনি। মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় দিইনি। জীবন্ত মানুষকে জমের হাতে তুলে দিইনি। মানুষের কাঁচা মাংস রাক্ষকের মুখে পূরে দিইনি। বরং দৃঢ়তার সহিত হানাদার বাহিনীর হাত থেকে স্বদেশের মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিকরূপে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলাম। আমার সে সংগ্রাম তথাগত বুদ্ধের নির্দেশিত অহিংস নীতিতে যতটুকু পেরেছি ততটুকু করেছি।

জীব সৃষ্টির নীতি যত দিন জগৎ বক্ষে বিদ্যমান থাকবে, ততদিন কেউ ভুলতে পারবে না যে, ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই দুই শত ছয়ষট্টি (২৬৬) রক্তাক্ত ও বিভীষিকাময় বাঙ্গালী জীবনের দিনগুলোর কথা। বিশ্বকোষে রক্তাক্ত বর্ণ-মালায় সকরুণ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে চিরকালের জন্য। ঐতিহাসিক ২৫ মার্চ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১ টা থেকে রাজধানী ঘুমন্ত ঢাকার বক্ষে গণহত্যার কিরূপ তান্ডব লীলা সংঘঠিত হইয়াছিল, তা বই পুস্তক পড়ে, টেলিভিশন দর্শন করে, লোক মুখে শ্রবণ করে বর্তমান প্রজন্ম উদীয়মান যুবকেরা ধারণা করতে পারবে না। ২৫ বছরের পূর্ব বৃত্তান্তের অনুভূতি ও উপলব্ধি করতে হলে তার বয়সের মাপকাঠি হতে হবে অন্ততঃ ৪০ বছর। তথাপি হবে না যদি তিনি দেশ প্রেমিক স্বচেতন ব্যক্তি না হন। ইতিহাস কলংকিত হোক আর উচ্চ প্রসংশিত হোক ইতিহাসকে সচেতন ব্যক্তি কখনও ভুলে না। ইতিহাস থেকে শিক্ষা লাভ করে ত্যাগের আকারে অথবা গ্রহণের আকারে। ইতিহাসকে ভুললে জীবন, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়।

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে রাজনৈতিক আলোচনার পুস্তক না হলেও ইহা ইতিহাস। ইহা দেশের ভ্রমণ কাহিনী বললেও অতুক্তি হয় না। এখন উক্ত পুস্তকটি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। সকল মহলে ইহা পুনঃরায় প্রকাশিত করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে। ১৯৭৬ সনে রাউজান নিবাসী প্রবীন শিক্ষাবিদ নিবারণ বাবুর সুযোগ্য পুত্র প্রকৌশলী বাবু কমলাংশু বড়ুয়া মহোদয় প্রথম সংস্করণ একক অর্থ ব্যয়ে প্রকাশ করেছিলেন। এখন আমার হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ছাত্র ও শুভানুধায়ীগণের সম্মিলিত অর্থ ব্যয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। বৌদ্ধ সমাজের কোন কোন মহলের ধারণা যে, "বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে" বৌদ্ধদের অবদান ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আজও নিরুপিত হয়নি এই ধারণা ভুল। এ পুস্তকের শেষের দিকে ক্ষয়ক্ষতির জরিপ অভিযান অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। মনোযোগ সহকারে পুস্তকটি পাঠ করলে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারবেন।

চাঁদা দাতাগণের এই উদ্যোগ সমাজ ও দেশাত্বক-বোধের পরিচায়ক। আমি তাদের সর্বতোমুখী শুভেচ্ছা পোষণ করি। তাছাড়া মুদ্রণ পরিপাঠ্য অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে ময়নামতি আর্ট প্রেসের স্বত্বাধিকারী বাবু সুকুমার বড়ুয়া যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছেন। তাঁকে আমি আন্তরিক আশীর্বাদ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি। এই পুস্তক দ্বারা যদি দেশের ও দশের কিঞ্চিৎমাত্র কল্যাণ সাধিত হয়, তবে দাতাগণের অর্থ ব্যয় ও লেখকের পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করব।

বাংলাদেশ শান্তিময় হোক।

বিশ্বশান্তি প্যাগোডা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বৈশাখী পূর্ণিমা, ২৫৪১ বুদ্ধাব্দ,
মে ১৯৯৭ ইংরেজী।

শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে

সূচীপত্র

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব-পশ্চিম বিরোধের পটভূমিকা ও জঙ্গী সরকারের অশুভ তৎপরতা

সুদীর্ঘ বাইশ বৎসর পর প্রথম বারের মত পাকিস্তান সরকার ১৯৭০ সনে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সনের ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত। এই সাধারণ নির্বাচন সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করেছিল যে, দেশের জনসাধারণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ট অংশ আওয়ামী লীগের ধর্ম নিরপেক্ষ ও গণতন্ত্রমূলক কর্মসূচীর পিছনে রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে আওয়ামী লীগ সদস্যই নির্বাচিত হলেন ১৬৭ জন। কিন্তু এই সংখ্যা গরিষ্টতা সরকারের নিকট অসহ্য গাত্র দাহের হেতু হয়ে দাঁড়াল। আইনসঙ্গতভাবে আওয়ামী লীগ দেশের শাসনভার পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করল। কিন্তু সব নির্বাচিত সদস্যগণের সম্মিলিত পরামর্শে জাতীয় গণপরিষদে একসঙ্গে বসে শাসনতন্ত্র আলোচনা বা প্রণয়ন করার অধিকার পাওয়া গেল না। অথচ এই নির্বাচনের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা। বস্তুতঃ নির্বাচনের প্রতি পাকিস্তান সরকারের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। পূর্বাঞ্চল কমান্ডের অধিনায়ক বা জিওসি জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব ঢাকা গ্যারিসনের অফিসারদের এক সমাবেশে ভাষণ দানকালে আয়ুব সরকারের পতনোত্তর ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণের সমাপ্তি পর্বে মন্তব্য করেছিলেন–"গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সরকারের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে এখন চূড়ান্ত পর্যায় এসে গেছে।" অবশ্য তিনি একথাও বলেছিলেন, "আপনারা ওদের (বাঙ্গালীদের) সাথে ভাল ব্যবহার করবেন।" প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জনগণকে বলেছিলেনঃ "আমি একজন সৈনিক, আমি ব্যারাকে ফিরে যেতে চাই।" জনগণকে আশ্বস্ত করার মত ভাষায় তিনি এভাবে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন–"পূর্ব পাকিস্তানের ৭৫ মিলিয়ন অধিবাসীকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সাথে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে হলে, তাদেরকে সরকারী পর্যায়ে প্রাপ্য সুযোগ দেওয়া উচিত।" কি সহজ স্বচ্ছ সত্য সরল তরল স্পষ্ট সংক্ষিপ্ত উক্তি। এতে জনগণ অবচেতন ব্যক্তিবর্গ একেবারে মুগ্ধ। এতে সন্দেহমূলক প্রমাদ গুণবার কি আছে? এদিকে সব কিছুর ব্যাপারেই পশ্চিম

পাকিস্তানীরা সিংহভাগ উপভোগ করত। বিদেশী সাহায্যের শতকরা ৭০ ভাগ নিয়োজিত হতো তাদেরই জন্য। পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রা আয়ের অংক একইভাবে আমদানিকৃত দ্রব্যের জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ব্যয় করা হতো। কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রের শতকরা ৯০ ভাগ এবং সেনাবাহিনীর শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে ওদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। সুস্পষ্ট কারণেই 'ছয় দফা' অথবা ইহার প্রণেতা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের প্রতি ইয়াহিয়া খানের অনুকূল ধারনার উদ্ভব হয়েছিল বলে জনগণের বিশ্বাস জন্মে ছিল। কিন্তু ইহা যে, রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি, রাজনৈতিক চাল-তা রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি ব্যতীত সকলের বোধগম্যে আসেনি। জনগণের এই ধারনার ভেতর কুঠারাঘাত আনল-১৯৭০ সনের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় যখন সাইক্লোন প্রচন্ড আঘাত হেনেছিল, তখন তাঁর জ্বলন্ত অবজ্ঞা ঔদাসিন্য ভাব তাঁর কীর্তিকে মারাত্মকভাবে বিধ্বস্ত করে ফেলছিল। বাঙ্গালীর প্রতি প্রকৃত মনোভাব উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। আসল চরিত্রটা ধরা পড়ে গিয়েছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত গভর্ণর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের এক অধিবেশনে জনশ্রুতির মাত্রা আরো বেড়ে দেয়। এখানে ইয়াহিয়া খান সমবেত সবাইকে জানিয়ে দেন, ৩রা মার্চ তারিখে ঢাকায় জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন হওয়ার কথা ছিলো তা অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত রাখা হয়েছে। এডমিরাল আহসান এবং লেঃ জেনারেল রহমান গুল উক্ত সিদ্ধান্ত পুনঃ বিবেচনার জন্য প্রেসিডেন্টকে বারংবার অনুরোধ জানান। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁদের কথায় কর্ণপাত না করে তাঁর সিদ্ধান্তে তিনি অটল থাকেন। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে আহসানকে ঢাকায় গিয়ে ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখার বিষয়টি ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে অবগত করান হয়। এর ফলে বাংলাদেশে উগ্র প্রতিক্রিয়া ঘটে। সারাদেশে এ ভাষণের পরপরই জনগণ রাস্তায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে। প্রতিবাদ মিছিলে ঢাকা সহ বিভিন্ন শহর বন্দরে রাস্তা ঘাট ভরে উঠে। লেঃ জেনারেল ইয়াকুব কারফিউ জারী করে সেনাবাহিনীকে যুদ্ধাবস্থার তৎপরতায় বিভিন্ন সড়ক পাহারা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এডমিরাল আহসান আবার একই বিষয় নিয়ে প্রেসিডেন্টকে বারবার অনুরোধ করাতে আহসানের প্রতি সন্দেহ জন্মিল যে, তিনি হয়তো পূর্ব পাকিস্তান প্রিয়। ফল ফলল বিপরীত-সেই রাতেই আহসানের পদচ্যুতি ঘটল। অন্যতম যুদ্ধবাজ লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে ইসলামাবাদে ডেকে এনে আহসানের স্থলে নিয়োগ করা হয়। ইতিমধ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বারংবার বিষোদ্গার করে বিভিন্ন উক্তি করেছিলেন। টিক্কা খানও অনুরূপ উক্তি বারবার করেছেন। যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদত্ত হলে আমি ওদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। টিক্কাকে প্রদত্ত পরিকল্পনার বিষয় হল-'শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ পন্থীকে নিশ্চিহ্ন করা হোক।' খান শাসকমগুলী ধারণা করেছিলেন যে, বন্দুকের নলে ও কামানের ফুৎকারে বাঙ্গালী

জাতিকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে শিমুলের তুলার ন্যায় উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু পাকিস্তানী জান্তা বিভাগ ধারণা করতে পারেননি যে, বাঙ্গালীর দুই হাত পরিমিত বাঁশের লাঠির মধ্যে বৈজয়ন্তী শক্তির উপাদান কত পরিমাণ প্রচ্ছন্ন শক্তির আকারে নিহিত ছিল। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রনায়কোচিত জ্ঞান ও বাগ্মিতার সেরা নিদর্শনে অস্থির জনসমুদ্রকে দীর্ঘতম মহাকাব্যের কথা স্বল্প কথায় বলেন। রমনা রেসকোর্সে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের আগমনে সত্যিকার অর্থে এক জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হয়। মন্ত্রমুগ্ধ জনতা যেন স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত ত্রাণকর্তার কণ্ঠস্বর শোনে। কণ্ঠস্বরটি বলতে থাকে–"তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে তৈরী হও। আমি সেদিন হুকুম দেওয়ার সময় নাও পেতে পারি, তোমাদের যা কিছু আছে তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। --- এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

পশ্চিমা শাসক মন্ডলীর বহুদিনের পোষিত আশংকা ছিল যে, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বাঙ্গালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে। তদ্ধেতু বহু বৎসর যাবৎ সরকার নানা প্রকার তালবাহানা করে সময় কাটিয়ে আসছিলেন। পাকিস্তানের সামরিক শাসকচক্র এতদিন যে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে রাজনীতির ছাঁচে ঢেলে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পাচ্ছিলেন, তা আওয়ামী লীগের স্বচ্ছ রাজনীতির প্রভাবে চিরতরে নস্যাৎ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাঁরা এবার প্রমাদ গুণতে শুরু করলেন। তাঁরা প্রমাদের উন্মাদনায় রাজনীতির সুষ্ঠু পরিস্থিতির বাস্তবতা মেনে নিতে কিছুতেই রাজি হলেন না। তাই তৎকালীন সামরিক শাসক-মন্ডলী রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের প্রত্যেক ধাপে তাল-বাহানা ও প্রতারণা শুরু করলেন। এতে এই প্রমানিত হল যে, তাঁরা কোন অবস্থাতেই পাকিস্তানের শাসনভার ও কর্তৃত্ব বাঙ্গালীদের উপর ছেড়ে দিতে নারাজ। স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ধর্ম-নীতি ও রাজনীতির মধ্যে সমন্বয় সাধনে যে কূটবুদ্ধি খেলেছিল-তা চিরতরে খ'সে পড়ল। অধর্মের প্রভাবে ধর্মের বন্ধন আর অক্ষুন্ন রাখতে পারল না। ভেদবুদ্ধি ও ভেদ-জ্ঞান এসে তাঁদের অন্তরকে কলুষিত করল। মনুষ্যত্ব বোধের বিলোপ সাধন করল।

বস্তুতঃ একটি জাতিকে বন্ধন, রক্ষণ ও সার্বভৌম অভ্যুদয়ের জন্য শুধু ধর্ম নয় কিংবা ধর্মের ন্যায় একটিমাত্র উপাদান যথেষ্ট নয়। এইজন্য বহু উপাদানের সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন। ভৌগোলিক সংস্থান, সংস্কৃতির সম্পর্ক, ইতিহাসের ক্রমঃধারা, ভাব-ভাষার একত্ব ও স্বভাব চরিত্রের সামঞ্জস্য না থাকলে জগতে কোন জাতি গঠিত হতে পারে না। জুলুমভিত্তিক অযৌক্তিক কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা কিংবা সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্ট হলেও জগতে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ভূগোল, ভাষা, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা দুই অঞ্চলের মধ্যে ২০০০ হাজার মাইলের ব্যবধান ঐসব যাবতীয় পার্থক্য অস্বীকার করে শুধু একটি মাত্র বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এক জাতিতে পরিণত করতে

যাওয়া স্বার্থ-সিদ্ধির একটি বিরাট ধাপ্পা ছাড়া আর কিছু নয়। এ সম্পর্কে রাজনীতিজ্ঞ নেতারা যে সব ভবিষ্যদ্বানী করে গেছেন, তাঁদের বাণী পরিণতিতে যথার্থ সত্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে সংখ্যা গরিষ্টতা অর্জনই পাকিস্তানী শাসক মন্ডলীর সকল দুরভিসন্ধিপূর্ণ উদ্দেশ্যের মূলে কুঠারাঘাত বিবেচিত হওয়ায় তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, যে কোন উপায়ে হোক দূর ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করে তুলতে হবে। তদ্ধেতু তাঁরা জাতির অগ্রবর্তী অংশ উর্বরা শক্তিসম্পন্ন মস্তিষ্ক বুদ্ধিজীবী, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর ছাত্র সম্প্রদায়ের ধ্বংস সাধন, নিরস্ত্র নিরীহ গণ-হত্যা এবং সংখ্যালঘু অমুসলমান সম্প্রদায়কে কাফের আখ্যা দিয়ে দেশ থেকে সমূলে উচ্ছেদ ও বিতাড়নের দুর্ধর্ষ অভিযান শুরু করলেন। এই অভিযানে যদি নিহত ও বিতাড়িতের সংখ্যা কয়েক কোটিতে পৌছে যায়, তা হলেই তো পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যালঘু অংশে উপনীত হয়ে একটি বোবা বধির ও গোলাম জাতিতে পরিণত হয়ে যাবে। চিরকালের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের পদানত হয়ে থাকবে। এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা ধ্বংস যজ্ঞের রক্তাক্ত অভিযান আরম্ভ করেছিলেন। বাঙ্গালী জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্প-বাণিজ্য সব কিছু ধ্বংস করে নির্মুল করার অভিযান সুপরিকল্পিতভাবেই চালিয়ে ছিলেন। জীব সৃষ্টির নীতি যতদিন জগতে বক্ষে বিদ্যমান থাকবে, ততদিন কেউ ভুলতে পারবে না যে, ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত-এই দুইশত ছয়ষট্টিটি রক্তাক্ত ও বিভীষিকাময় বাঙ্গালী জীবনের দিনগুলোর কথা। বিশ্বকোষে রক্তাক্ত বর্ণমালায় তা করুণ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ থাকবে চিরকালের জন্য। ঐতিহাসিক ২৫শে মার্চ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১১টা থেকে রাজধানী ঢাকার বক্ষে গণ-হত্যার তান্ডবলীলা আরম্ভ হয়। ঘুমন্ত ঢাকার উপর আক্রমন চালাবার জন্য সামরিক শাসকগোষ্ঠী সাঁজোয়া ট্যাংক গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর তিনটি ব্যাটালিয়ান ব্যবহার করে এক লোমহর্ষক হৃদয় বিদারী ব্যাপক গণ-হত্যায় নিযুক্ত হয়। ২৬শে মার্চ থেকে ঢাকা শহর ত্যাগ করে লাখ লাখ মানুষ পালাতে আরম্ভ করে। ঢাকা শহরের সর্বত্র গণ-হত্যা, লুট-তরাজ, অত্যাচার, উৎপীড়িত, জনহিতকর সমাজ হিতকর প্রতিষ্ঠান ধ্বংস, নারী নির্যাতন আরম্ভ হয় এবং ঢাকা থেকে ক্রমশঃ মফঃস্বলে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার দিকে দিকে, শহরে বন্দরে, গ্রাম গ্রামান্তরে ধ্বংসলীলা, নিধনযজ্ঞ অবাধ গতিতে চলতে থাকে। তখনো আমার বাসভূমি বরইগাঁও গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ বিহার, পালি বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম, সমাজ কল্যাণ সংস্থা, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্তব্যে যথারীতি নিযুক্ত ছিলাম। লোক মুখে, রেডিও মারফতে বিভীষিকাময় সংবাদ সকাল-বিকাল কানে আসতে লাগল। তখন লোকজন আনা-গোনা করার সকল প্রকার যানবাহন বন্ধ। পদব্রজে ব্যতীত যাতায়তের অন্য উপায় ছিল না। দিনের পর দিন পথশ্রমে পরিশ্রান্ত হয়ে বিহারে আশ্রয়প্রার্থী বহু হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধের প্রতিদিন সমাগম হতে লাগল। তাদের কেউ ঢাকা থেকে নোয়াখালী,

চট্টগ্রামগামী, কেহ কেহ বা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম হতে ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, রংপুরগামী মুসাফির। আমার আশ্রমে আশ্রিত লোকজনের যথাসম্ভব আমি সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। তাদের অসুখ-বিসুখে যথাসাধ্য সেবা শুশ্রুষা করেছি। আমি তখনও ভাবতে পারিনি যে, দু'দিন পরে আমাকেও সর্বহারা উদ্বাস্তুর ন্যায় কাঁদতে কাঁদতে এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে এবং বিহারে আশ্রিত লোকগুলোর ন্যায় আমাকেও অন্যত্র আশ্রয় নিতে হবে। যখন বাংলার সর্বত্র অত্যাচার, অবিচার, হত্যা লুণ্ঠন, রাহাজানি, নারী নির্যাতন, গৃহ-দাহ ইত্যাদি অরাজকতার তান্ডবলীলার গতি অবাধে চলছিল, তখন আমার এলাকাতেও নৈরাজ্য মনোভাবের অশুভ তৎপরতা আরম্ভ হয়েছিল। এক শ্রেণীর লোক কৌশলে ও ভদ্র ভাবে অবিচার অত্যাচার শুরু করল। এক শ্রেণীর লোকের উপর বড় বড় দাগের চাঁদা ধার্য ও আদায় করার উৎসব অনুষ্ঠিত হতে লাগল। তারা যুক্তি প্রদর্শন করতে লাগল, দেশে বড় অভাব, অনটন, প্রায়শঃ দু'র্ভিক্ষ। এই সংগৃহীত চাঁদায় গরীব দুঃখী দুর্গতের সাহায্য করা হবে। আমি লক্ষ্য করলাম,-এই চাঁদার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? এইসব চাঁদা কারা দিচ্ছে, কারা নিচ্ছে, কারা বা তথাকথিত দীন দুঃস্থ। এই যথার্থ তাৎপর্য অবগত হলেও তখন কিছু বলার যো ছিল না। তবে আমি বাক্যস্ফুরণ না করলেও বিচারবুদ্ধি তো হারাইনি। তখন তো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলির পাঁঠা। নদীর নিম্নগামী স্রোতের মেষ শাবক। দেশের পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আমি আগেই অনাথ আশ্রমের অনাথ বালকদের নিজ নিজ বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তাতে খরচ কমে গেল। কেয়ার থেকে প্রাপ্ত খাদ্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণ ছিল। তদ্বারা এবং গ্রাম থেকে চাউল ভিক্ষা করে আশ্রয় প্রার্থীদের ক্ষুধা মিঠিয়েছি। আমার গ্রাম থেকে যুবক ছেলে ডেকে এনে চারদিকের গ্রামে ভিক্ষার জন্য পাঠিয়েছি। ছেলেদের মধ্যে ছিল আশুতোষ, গান্ধী, বীর সেন (এখন ভিক্ষু শীলভদ্র) মিলন, আমিনুল হক, হাসানুজ্জামান, সুখেন্দু প্রভৃতি তাদের ভিক্ষালব্দ ডাল-চাউল লাকসাম সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধার রসদ যোগিয়েছি। ইতিমধ্যে দক্ষিণ থেকে উত্তরে, উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং পশ্চিম থেকে পূর্বাভিমুখী গমনাগমনকারী আশ্রিত লোকের সংখ্যা আমার বিহারে কত যে হয়েছিল, তার হিসাব আমি রক্ষা করিনি। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, ২৮/২৯শে মার্চ থেকে ১৪/১৫ইং এপ্রিলের মধ্যে আমার আশ্রমে কয়েক হাজার আশ্রয়প্রার্থীর যাতায়াত হয়েছিল। আমি তাদের সকলকে সমদৃষ্টিতে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছি। স্বজাতিবোধে বহু আশ্রয়প্রার্থী স্বসম্প্রদায়ের কাছে আশ্রয় চাইলে স্বসাম্প্রদায়িক লোকেরা আমার আশ্রম দেখিয়ে দিয়েছে। আমি তাদেরকে অবহেলা করিনি। আমার ভান্ডার নিঃশেষ হওয়ার পর গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে আশ্রয় প্রার্থীদের সেবা যত্ন করেছি। দুর্বুদ্ধি পরায়ণ লোকেরা আশ্রয়প্রার্থীকে আমার আশ্রম প্রদর্শন করে আমাকে ধর্মপুণ্যের সুযোগ দিয়েছে বলে মনে করেছি।

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, উপজাতি সকলকে এক মানবাত্মাবোধে ও সাম্যভাবেই গ্রহণ করেছি। অহিংসা ধর্মের নীতি থেকে আমি এক বিন্দুও স্খলিত হইনি। আমার অনাথ আশ্রমে, সমাজ-কল্যাণ সংস্থায় বয়ন বিদ্যালয়ে, উলনিটিং ফ্যাক্টরীতে, সিব্বন কারখানায় সম্প্রদায় ভেদের পরিচয় দিইনি। সকল সম্প্রদায়ের জন্য আমার প্রতিষ্ঠানের দ্বার উন্মুক্ত ছিল, এখনো অবারিত দ্বার যেমন পরিচালক কমিটিতে, কর্মচারীদের মধ্যে, ছাত্র সংঘের মধ্যে, সবক্ষেত্রে সমতুল্য। আমার বিশেষ পদবী হচ্ছে,-আমি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। এটা কিন্তু আমার জীবনের পরবর্তী বা দ্বিতীয় ধাপ। প্রথমতঃ আমি মানব শিশুরূপেই জন্ম পরিগ্রহ করেছিলাম। মানবত্ববোধের উন্মেষ সাধনই আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচনা করেছিলাম। ধর্ম বা ভিক্ষুর মনুষ্যত্বের ক্রম বিকাশমাত্র।

তা'ছাড়া আমি আজীবন পালি বিদ্যালয় ও হাই স্কুল শিক্ষক। পাবলিক লাইব্রেরী প্রভৃতি বেশ কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। আমার বাসস্থান হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মের পীঠস্থান বৌদ্ধ বিহার। এই বিহারকেও আমি বৌদ্ধ সমাজের সীমায় আবদ্ধ করে রাখিনি। আজীবন বহু দীনদুঃখী হিন্দু, মুসলমান ছেলেকেও নিজের সঙ্গে বিহারে রেখে জীবনোন্নতির দায়িত্ব পালন করে এসেছি। অপ্রতিষ্ঠিতকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছি। তজ্জন্য এ অঞ্চলের হিন্দু বৌদ্ধেরা আমাকে গুরুর তুল্য এবং মুসলমানেরা পীরের ন্যায় ব্যবহার করেন। কিন্তু কালের বিচিত্র গতি। নিষ্ঠুর কাল কোন মহামানবকেও রেহাই দেয় না। রাজনীতির কুটচক্র রাষ্ট্র বিপ্লবের অমোঘ বিধান শেষকালে আমাকেও রেহাই দিল না। অশুভ শক্তি তার শত সহস্র শকুন ধারাল চঞ্চুতে বিদীর্ণ করল সমাজকে, সভ্যতাকে, মানবতাবাদী সজ্ঞান সজ্জন ব্যক্তিকে।

হানাদার বাহিনীর রোষ দৃষ্টিতে

১৩ই এপ্রিল, মঙ্গলবারের শেষ বেলা। উত্তরাকাশ ভীষণ কাল বৈশাখীর কাল ঘনচ্ছটায় আচ্ছন্ন। মুহূর্মুহূঃ মেঘ গর্জন। আবার আকাশ তলে কামানের গর্জন ও গোলাগুলির বিকট শব্দে আকাশ পাতাল কম্পমান। লাকসাম থেকে উত্তরাভিমুখী অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার প্রস্তুতি, অভিযান আর আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও সমর সজ্জায় সুসজ্জিত অগণিত পাক-বাহিনী কুমিল্লা লাকসাম সড়কে দক্ষিণাভিমুখে সদম্ভ পদক্ষেপ। মুক্তিবাহিনীর লোকেরা লাকসাম, কুমিল্লা সড়কে সাধারণ মানুষের যাতায়ত বন্ধ করে দিয়েছে এবং সড়কের উভয় পার্শ্ববর্তী বাড়ীঘর থেকে লোকজন সরিয়ে দিয়েছে।

এমতাবস্থায় আমার গ্রামবাসী মোঃ আফছরুদ্দিন মিঞা বিহারের সম্মুখ দিয়ে বড় রাস্তার দিকে সাইকেল যোগে অগ্রসর হতেই তাঁর উপর আমার চোখ পড়ল। আমি তাঁকে বারবার নিষেধ করলাম। কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাত না করে চলে গেলেন। সম্ভবতঃ সেই রাত্রি তিনি তাঁর কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে যাপন করেছিলেন। ১৪ই এপ্রিল বুধবার বাড়ী ফেরবার পথে আলীশ্বর রোডের উপর মুক্তিবাহিনীর মেজরের চোখে পড়ায় আফছরুদ্দিন মিঞাকে পাক-বাহিনীর গুপ্তচর সন্দেহে মেজর তখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। এই অঞ্চলের অনেক লোকের অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও মেজর তাঁকে কিছুতেই ছাড়ল না। তাঁকে নিয়ে গেল ভারত সীমান্তে। এই নিয়ে গ্রামের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। শেষ পর্যন্ত এই উত্তেজনায় আরোপিত হলো আমার বিরুদ্ধে অমার্জনীয় অভিযোগ-আমিই আফছরুদ্দিন মিঞাকে নাকি মুক্তিযোদ্ধার হাতে ধরিয়ে দিয়েছি। অথচ আফছরুদ্দিন মিঞা আমার বাল্যবন্ধু। সহপাঠী, বর্তমানে গ্রাম ও সমাজের নানাবিধ জনহিত কার্যে সহযোগী। প্রত্যেক কাজে আফছরুদ্দিন মিঞার কাছ থেকে সক্রিয় সহযোগিতা লাভেই আমি সাফল্য লাভ করেছি। আমার বিহারে আমাদের ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠানেও আফছরুদ্দিন মিঞা অনেক দায়িত্ব সম্পন্ন ও কর্তব্য সম্পাদন করে থাকেন। তাঁর সঙ্গে আমার কোনরূপ বিরোধ কখনো ঘটেনি। এমন কোনদিন নেই, আফছরুদ্দিন মিঞা যেদিন অন্ততঃ একবার বিহারে না আসেন। এমন সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের মধ্যেও সেই আফছরুদ্দিন মিঞার জন্য আমি অন্যের নিকট রীতিমত বিরূপ ভাজন হয়েছি। আসলে বাঘের কাছে মেষ শাবকের অপরাধ সুচিত হওয়ার ন্যায় আমার অমার্জনীয় অপরাধ গৃহীত হলো। এই অযৌক্তিক ও মিথ্যা দোষারোপ আমার জীবনে প্রথম কলঙ্ক।

১৫ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে লাকসামের উত্তর অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর ও পাক-বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। একটানা যুদ্ধ চললো বিকাল সাড়ে চারটা কি পাঁচটা পর্যন্ত। এই যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা অনুমানের বাহিরে। অবশেষে পাক-বাহিনীর দাপটে মুক্তিবাহিনী পিছনে হটতে বাধ্য হলো। হানাদার বাহিনী তার দোসরদের অত্যাচারে এই অঞ্চলে কেউ আর বাড়ী ঘরে থাকতে পারল না। পুড়ে ছাই করে ফেললো-রাস্তার উভয় পার্শ্বের বাড়ী ঘর, তারা যখন যাকে যেখানে পেয়েছে তাকেই গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছে। মায়ের বুক থেকে কচি শিশুকে টেনে পুকুরে ফেলে দিয়েছে। এরূপ ঘটনার নজীরও তারা রেখে গেছে। কত শত অচল অক্ষম বৃদ্ধ লোক দ্বারা জোর জবরদস্তি করে পথঘাট বাঁধিয়েছে। অশীতিপর বৃদ্ধ মহাস্থবির শ্মশানবাসী শ্রীধর্ম রক্ষিত ভিক্ষুকে আলীশ্বর শ্মশান থেকে টেনে এনে রাস্তা বাঁধার কাজে মাটি ও ইট বহন করতে বাধ্য করেছে। অথচ পুরা দু'দিন এক রাত তাঁকে কিছুই খেতে দেয়নি। আশ্চর্য, তবু তিনি ছিলেন হাস্য-মুখী। লালমাই থেকে লাকসাম পর্যন্ত এই সাত মাইলের মধ্যে তারা রাস্তার উভয় পার্শ্বের পঞ্চাশেরও বেশী নিরীহ গ্রামীন লোককে নিষ্ঠুরভাবে

হত্যা করেছে। এইসব মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে যে ঘটনাটি আমার অন্তরে সর্বাধিক আঘাত হেনেছে, তাহলো, কাকসারের মোঃ ইদ্রিস খলিফার একমাত্র পুত্র-আমার প্রিয় প্রাক্তন ছাত্র মৌলভী শামছুল হকের মৃত্যু। শামছুল হক ছিল সাধারণ শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষা দু'দিকেই উচ্চ শিক্ষার অধিকারী। অটুট তাঁর স্বাস্থ্য, কমনীয় কান্তি, পাকা ইসলামী বেশ ভুষা ও আধুনিকতার অপূর্ব সমন্বয় ছিল শামছুল হকের জীবনে। দুষ্ট বিক্রান্ত যুদ্ধ দুর্ম্মদ জল্লাদেরা যখন বাড়ীর সামনে তার পিতা সহ চারজনকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করলো, তখন শামছুল হক বলে উঠল "ম্যায় তো মৌলবী হুঁ মুসলমান হুঁ। জল্লাদ সেনা বলে উঠল-তোম্ মওলবীভি নহী, মোছলমান ভি নহী, তোম্ বাঙ্গালী হো-এই বলে শামছুল হককে গুলি বিদ্ধ করল। গুলির সঙ্গে সঙ্গে শামছুল হকের রক্তাক্ত দেহ ভুমিতে ধ্বসে পড়ল এবং ধড়পড় ছটপট করতে লাগল। শামছুল হকের পিতা ইদ্রিস খলিফা প্রাণপ্রতিম পুত্রের এই মর্মঘাতী দৃশ্যে গুলিবিদ্ধ হবার আগেই মুর্চ্ছিত হয়ে ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। জল্লাদেরা অপর দুইজনকেও পরপর গুলি করে নিহত করল। ঘটনাক্রমে সেদিন ইদ্রিস খলিফা প্রাণে বেঁচে গেল। তারা মনে করল সেও মৃত্যুমুখে পতিত, শামছুল হক ও তার সঙ্গীদের তাজা রক্তে মৃত্তিকাময় পৃথিবী লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হয়ে যায়। এভাবে কাকসার গ্রামেরই বাইশ জন লোক নিহত হয়। হঠাৎ এই হৃদয় বিদারী খবরে আমার অন্তরাত্মায় গুর গুর কম্পন আরম্ভ হয়।

১৬ই এপ্রিল শুক্রবার বাংলার নব বর্ষের প্রথম দিবস। নতুন বছরকে বরণাভিনন্দন জানিয়ে আমাদের গ্রামবাসী বৌদ্ধেরা চিরাচরিত প্রথানুসারে বৎসরের প্রথম দিন বুদ্ধ পুজাদির আয়োজন করলেন। আমরা সকলে মন্দিরের বারান্দায় সমবেত বন্দনা ও বুদ্ধ পূজা করার উদ্দেশ্যে আসন গ্রহণ করেছি – এমনি সময়ে উত্তর-পূর্ব কোণে বাগমারা বাজারের দিকে গুড়ুম গুড়ুম করে মুহূর্মুহূঃ কামান ও বোমার শব্দ কর্ণ বিদীর্ণ হতে লাগল। লোকজন ছুটাছুটি আরম্ভ করল।

যুদ্ধ বিগ্রহের এরূপ দাপটে আতংকিত চিত্তে পহেলা বৈশাখের মঙ্গলোৎসব এই মহা সংকট মুহূর্তে বিপদ থেকে পরিত্রাণের কামনায় অন্তর একান্ত অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সবাইর চিত্ত সর্বক্ষণ আতংকগ্রস্ত। বুদ্ধ পূজার প্রতি একাগ্রতা কোথায়? কোন রকমে বুদ্ধের স্মরণ পূজা সমাপ্ত করা হলো।

বরইগাঁও গ্রামটি ডাকাতিয়া নদীর পশ্চিমে আধা মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। নদীর উপর একটি কাঠের পোল। মুক্তিবাহিনীর লোকেরা আগেই এই পোলের অর্ধেক ভেঙ্গে ফেলেছিল। তাই পাক-বাহিনী সরাসরি নদীর পশ্চিম তীরে পৌঁছতে পারেনি। শুক্রবার সন্ধ্যায় পাক-বাহিনী নদীর পূর্ব তীরে এসে "বরইগাঁও কিদার হ্যাঁয়; জ্যোতিঃপাল মহাথের কোন্ হ্যায়, আপ্ লোক উসকো জানতে হ্যায়"? এভাবে আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করে খুঁজতে আরম্ভ করলে আমার ছাত্রেরা আমার কাছে এই খবর পৌঁছাল রাত্রি ৯টায়। এই খবরে আমার অন্তরাত্মা একেবারে শুকিয়ে গেল। ছাত্রেরা সেই রাত্রি আমাকে বিহারে থাকতে দিল না। আমার প্রিয় ছাত্র মোঃ আমিনুল হক আমার বিছানা পত্র নিয়ে

আমাকে পৌঁছিয়ে দিল আমার জন্মভূমি কেমতলীর বাড়ীতে। তের বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করার পর ৫৯ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্ব-গৃহে আর রাত্রি যাপন হয়নি। সারারাত্রি চোখ বোঝে পড়েই রইলাম। পাঁচ মিনিটের জন্যও আমার চোখে তন্দ্রা এল না।

বিছানায় শুয়ে বসে কেবল ভাবতে লাগলাম পাক বাহিনীর লোকেরা আমাকে খোঁজ করেছে। আমার নাম ধাম কিভাবে তারা সংগ্রহ করলো? তখন মনে পড়রো আরও কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে আমি বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে পাকিস্তানী কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের নেক নজরে পড়েছিলাম। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ – আমি 'পুদ্‌গল প্রজ্ঞপ্তি' ও 'কর্মতত্ব' নামে দু'টি বই লিখেছি। বইগুলো যে সব শ্রদ্ধাবান দায়ক দায়িকার অর্থে প্রকাশ করেছি, তাঁরা এখন ভারতে অবস্থান করছেন। কাজেই সেই অর্থানুকূল্যে আমি ভারতীয় ভাবধারা প্রচারে ও প্রকাশে ভারতের এজেন্ট রূপে পাকিস্তানে আমার সাংগ-পাঙ্গদের নিয়ে তৎপর রয়েছি।

নির্বাচন মোকাবেলায় ভীত ও পরাজিত ব্যক্তিরা তখন সমাজ ও ধর্মের সকল স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে স্বীয় জঘন্য মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য কেবল আমার বিরুদ্ধে নয়, সংঘের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে পর্যন্ত তথাকাথিত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ এনে 'খেতাবের' জোরে গোয়েন্দা বিভাগকে লেলিয়ে দিয়েছিল। ধর্মগ্রন্থ দু'টি আমি যাদেরকে একসময় একান্ত শ্রদ্ধাভরে উপহার দিয়েছিলাম তারাই অভিযোগ সপ্রমান করার মানসে আমার বিরুদ্ধে বইগুলো গোয়ান্দা বিভাগে জমা গিয়েছিল। আমার বহুদিনের সাধ্য সাধনার ধর্মগ্রন্থ এখন মারণাস্ত্ররূপে আমার সম্মুখে হাজির হলো। এই বই দু'টি এখন ঢাকা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের স্নাতকোত্তর এম, এ ক্লাসের পাঠ্য।

গোয়েন্দা বিভাগের সেই তদন্ত তৎপরতার হয়রানির মোকাবেলা করতে চট্টগ্রামে সংঘের প্রচার সম্পাদক বাবু বিমলেন্দু বড়ুয়া, যুগ্ম সম্পাদক এড্‌ভোকেট বাবু সুগত কান্তি বড়ুয়া, সহ-সভাপতি বাবু বিজয়শ্রী বড়ুয়া, শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ মহাথের, বাবু সুরথ চন্দ্র বড়ুয়া, বাবু ব্রহ্ম দত্ত বড়ুয়া প্রমুখ কর্মকর্তাদের এবং ঢাকায় সংঘের সাধারণ সম্পাদক মিঃ ডি, পি, বড়ুয়া ও আমার রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল। এখন খান সেনারা আমার নাম ধাম নিয়ে খোঁজ করেছে দেখে আমি বাস্তবিকই আতংকিত হয়ে পড়লাম। আমি বুঝতে পারলাম যে, তারা নিশ্চয়ই গোয়েন্দা বিভাগ থেকে আমার নাম ধাম ইত্যাদি সংগ্রহ করেছে অথবা সুযোগ বুঝে সংঘের নির্বাচনে পরাজিত ব্যক্তিরা ইতিমধ্যে খান সেনাদের নিকট রিপোর্ট করেছে। সুতরাং এখানে থাকা আমার কিছুতেই আর নিরাপদ নয়।

ভোররাতে পাড়া প্রতিবেশীর অলক্ষ্যেই আবার বিহারে চলে আসি। অন্যদিনের মত প্রাতঃকৃত্য সমূহ সম্পন্ন করলেও মন কিন্তু চিন্তায় বিভোর। আজ কয়েকদিন যাবত চোখে নিদ্রা নেই, রীতিমত স্নানাহার নেই। এতে শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

ভাবলাম-সম্মুখে মহাবিপদ। চারদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। এখন যদি আমি দেশত্যাগ না করি, তবে এ দেশের ভিক্ষুরা এ অঞ্চলের বৌদ্ধ ও অন্য জনসাধারণ যারা আমার দিকে চেয়ে আছে- তাদের কেউ দেশ থেকে বের হবে না। ফলে তারা সবাই পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগিগণের অবাধ শিকারে পরিণত হবে। এখন কাউকেও কিছু বলার সময় সুযোগ নেই, কিংবা কারো সাথে সাক্ষাতের অবকাশও নেই। আমিই সর্বাগ্রে দেশ ত্যাগ করব এবং অন্য সবাইর নিকট নজির সৃষ্টি করব। এরূপ আন্তরিক সিদ্ধান্তে রওয়ানা হওয়ার জন্য আমি প্রস্তুত হতে লাগলাম।

আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে

১৭ই এপ্রিল শনিবার এগারটায় সামান্য আহারের পর মুখ প্রক্ষালন করতেই দেখি, আমার প্রাক্তন ছাত্র তথা সহকর্মী মোঃ হাসানুজ্জামান ও মোঃ রফিকুল হক মজুমদার আমার বাসগৃহ লাইব্রেরীর বহিরালিন্দে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাদের দিকে অগ্রসর হতেই হাসু আমার সামনে এসে বলল 'ভন্তে' আপনি কিছুদিনের জন্য অন্যত্র সরে থাকুন। আমি কিছু না জানার ছলে জিজ্ঞেস করলাম-ব্যাপার কি? হাসু বললো-এখন কিছু বলার সময় নেই, আপনাকে এক্ষণই বের হতে হবে। নচেৎ বিপদের সম্ভাবনা আছে। তখন তার কথায় আমার ধৈর্য ও প্রাণের আবেগ সংবরণ সাধ্যের অতীত হয়ে গিয়েছিল। আমি তাদেরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। তারা আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরম্ভ করল। সেইদিন নাকি আমাকে পাঞ্জাবীদের হাতে ধরিয়ে দিবার মানসে হানাদার বাহিনীর দুইজন সহচর একখানি চিঠি নিয়ে পাঞ্জাবীদের নিকট রওনা হবার প্রাক্কালে অন্য গ্রামের এক সহৃদয় ব্যক্তি তাদেরই আত্মীয় চিঠিখানি দেখল এবং পড়ল। "তোরা সব কি পাগল হলি?" চিঠিখানি ছিড়ে ফেলে দিল। এজন্যই হাসু ও রফিক আমাকে যত শীঘ্র পারা যায় বের করে নেওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করছিল। কিন্তু সময় নেই। বিপদ সম্মুখে। তারা তাড়াতাড়ি আমার ব্যবহার্য কিছু দ্রব্য থলেতে পুরল এবং ছাতাখানি হাতে নিল। আমি আমার উত্তরীয় বস্ত্রখানি পারুপণ করে তৎক্ষণাৎ তথাগত বুদ্ধের অনন্ত গুণাবলী স্মরণ করে বিহার থেকে বের হয়ে পড়লাম। রফিক আমার আগে হাসু পিছনে। হঠাৎ হাসুর মা তাকে ডেকে নিয়ে গেল। বরইগাঁও গ্রামের সীমা অতিক্রম করেই শুনতে পেলাম জনাব রেয়াজুদ্দিন মজুমদার প্রতিবেশী হিন্দুদের উপর অত্যাচার অবিচার ও বাড়ী ঘর লুট তরাজের বীভৎস দৃশ্য দেখে সংজ্ঞা হীন হয়ে পড়েছেন। তাঁর কনিষ্ট পুত্র শফিক ডাক্তারের জন্য লাকসাম গিয়েছে। পিতার এই দুঃসংবাদ শুনেও রফিক আমার সঙ্গ ত্যাগ করে বাড়ী ফেরার কোনরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করল না। আমার জীবন রক্ষা করাই তার অন্তরে বড় হয়ে উঠেছিল। রফিক আমার সঙ্গে সঙ্গে আলোকদিয়া গ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হল। মাঠে এসে দেখি, সারা মাঠে, পথে-ঘাটে লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে। গরু, ছাগল, ধান-চাউল, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি লুটের মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে। লুটের মালামাল সংগ্রহের কি তৎপরতা, কি আনন্দ তাদের।

এসব মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি আলোকদিয়া বিহারে ও নুরপুর বিহারে গিয়ে পুজনীয় ভন্তেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কিছুক্ষণ পরে যখন তঁদের পদধুলি মাথায় নিয়ে বিদায় নিচ্ছিলাম, তখন পূজ্য শ্রীমৎ পুর্ণানন্দ মহাস্থবির ও আমার প্রাক্তন ছাত্র, সুধীর সিংহ, কল্যাণমিত্র বড়ুয়া প্রভৃতি সবাই কাঁদতে আরম্ভ করেন। আমি তাঁদের থেকে বিদায় নিয়ে ক্রমশঃ উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকি। আমার এই গমনের চরম লক্ষ্য ভারতবর্ষ হলেও আজ কোথায় যাব, কোথায় থাকব নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা ছিল না। অবশেষে বেলা পাঁচটার সময় পাইকপাড়া গ্রামের এক আত্মীয় বাড়ীতে পৌঁছালে তারা আমাকে সহানুভূতির সহিত অভ্যর্থনা করলেন।

হঠাৎ অন্ধকার করে মেঘের সঞ্চার হলো। প্রবল বেগে বায়ুবেগ সহ মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি প্রায় এক ঘন্টা কাল স্থায়ী হয়। বৃষ্টির পরে দেখি, আমার হাসু সেখানে হাজির, অর্থাৎ হাসু আমার উপর কোনরূপ সম্ভাব্য বিপদের চিন্তায় দীর্ঘপথ আমার অলক্ষ্যে পিছনে পিছনে ছিল। সন্ধ্যায় হাসুর মুখে শুনলাম-আমি বিহার ত্যাগ করার পরক্ষণেই আমার গ্রামবাসী কিছু সংখ্যক লোক বিহারে এসে হামলা চালায় এবং আমার শিষ্য সেবকের উপর অতিশয় অপমানজনক ব্যবহার করে। তাদের মনে উগ্র উত্তেজনা। তাদের লক্ষ্য ছিলাম আমি। আমাকে না পেয়েই আমার লোকের উপর এই আক্রোশ। আমাকে পেলে যে কি করত কে জানে। তারা আমার শিষ্যদের উপর দুর্ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়নি, আমাকে ফেরৎ নেওয়ার জন্য আমার বরিশালবাসী শিষ্যকে আমার খোঁজে বের হতে বাধ্য করেছে। তারা নিজেও আমাকে ধরবার জন্য আমার অনুসরণ করেছে। অবশ্য কেউ আমার সাক্ষাৎ পায়নি। যাদের কাছে আমার খোঁজ খবর জিজ্ঞেস করেছে,–তারা কেউ ঠিক কথা বলেনি, আমি কোন পথে কোথায় গিয়েছি।

ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আফছরুদ্দিন মজুমদার ছোট বেলা থেকেই আমার শুভানুধ্যায়ী। সুখে-দুঃখে সহানুভূতিশীল, আমার পিতা পিতৃব্যতুল্য। আমার এই নছিবতের কথা শুনে তিনি বিহারে ছুটে এসেছিলেন অগ্নিতে শীতল বারি বর্ষনের জন্য। তখন তাঁর কথা কে শুনে? প্রায় সকলের অন্তরেই প্রচন্ড ক্রোধ ও মাথায় অত্যুগ্র উত্তেজনা। এসব খবর পেলাম গ্রামের ছেলে মরণশীলের মুখে। মরণশীল আমার পরে পাইকপাড়া পৌঁছে ছিল। এসব আলোচনা করতে করতে রাত্রি গভীর হয়ে গেল। হাসুকে ও মরণশীলকে এই বলে বিদায় দিলাম যে, জীবনে বেঁচে থাকলে দেখা হবে। তোমরা আর আমার সঙ্গে থেকো না। বরইগাঁও গ্রামেও যেওনা। অতীব সাবধানে ভারতে চলে যাওয়ার চেষ্টা করো।

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আত্মীয়ের বাড়ীতে অতিবাহিত করার পর হঠাৎ সেখানে যতীন্দ্র মাষ্টারের সাক্ষাৎ পাই। যতীন্দ্র মাষ্টার বাগমারা হাই স্কুলের শিক্ষক। বিপদকালীন বন্ধু যতীন্দ্র মাষ্টার রাত্রি দুইটার সময় আমাকে নিয়ে চলল তার নিজ গ্রাম কেশনপাড়। কেশনপাড় গিয়ে আমি যখন পৌঁছি তখন রাত্রি ভোর হয়েছে, কাক ডাকছে। যতীন্দ্র মাষ্টার আমাকে তাঁর বাড়ীর একটি ছোট কুঁড়ে ঘরে গোপনভাবে আসন প্রদান করল।

রাত্রি প্রভাত হতেই দেখি-পাইক পাড়ার শ্যামদা টিফিনবক্স করে আমার জন্য প্রচুর খাবার নিয়ে হাজির। আহার করলাম নামমাত্র দুর্ভাবনার দুর্ভেদ্য আবেষ্টনী ভেদ করে আহার ভিতরে যেতে চায় না। চোখ বোজে বিছানায় পড়েই রইলাম।

কুমিল্লা, চাঁদপুর সড়কের পাশে কেশনপাড় গ্রাম। রোডের থেকে যতীন্দ্র মাষ্টারের বাড়ী মাত্র একশত গজ দূরে অবস্থিত। কতক্ষণ পর পর পাক বাহিনীর যাতায়াত দেখা যায়, গাড়ীর শব্দ শুনা যায়। এজন্য অতীব আতংক চিত্তে সময়টুকু কাটছে। কি জানি, পাক বাহিনীর লোকেরা যতীন্দ্র মাষ্টারের বাড়ীতে এসে হানা দেয় নাকি? ইতিপূর্বে কয়েকবার এরা এই বাড়ীতে এসে বহু উৎপাত করেছে। যতীন্দ্র মাষ্টারের বাড়ী সহ অল্প কয়েকটি বাড়ীর ছোট একটি পাড়া। পাড়ার মধ্যে অশীতিপর এক বৃদ্ধ ছাড়া আর কেউ নেই। পাড়াটি সর্বতো শুন্য সকরুণ দৃশ্যে, ভয় ও আতংকের সাক্ষী স্বরূপ বিরাজ করেছে।

যতীন্দ্র মাষ্টার আমাকে পূর্বদিকে পার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাগমারা, দত্তপুর অঞ্চলে গিয়ে দেখল, মুচিপাড়া পুড়ে ছাই করে ফেলছে, দত্তপুর গ্রামের প্রায় বাড়ীতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। জিলা বোর্ডের বড় রাস্তায়, রেল লাইনের বাজারে পাক বাহিনী ইতস্ততঃ টহল দিচ্ছে। যতীন্দ্র মাষ্টারের মুখে এই খবর শুনে আরও বেশী সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম। এমতাবস্থায় আমার পক্ষে এখান থেকে পিছনে হটবার কিংবা সামনে এগুবার যো ছিল না। জলে কুম্ভীর ডাংগায় বাঘ, এরূপ পরিস্থিতিতে পড়লাম।

বেলা একটার সময় আলীশ্বরের মহিম নামে আমার এক আত্মীয় তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সুখ-দুঃখের তত্ত্ব নেওয়ার জন্য কেশনপাড় উপস্থিত হল। তার মুখে শুনলাম-পাকবাহিনী লাকসাম থেকে নোয়াখালীর দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। আলীশ্বর অঞ্চল এখন অনেকটা মুক্ত। খুব কচিৎ সে অঞ্চলে তাদের আনা গোনা দৃষ্ট হয়। এর ফাঁকে আলীশ্বর হয়ে গেলেই আমার পক্ষে নিরাপদ হবে। তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে কেশনপাড় ছেড়ে আলীশ্বরের দিকে রওনা হলেম। আমার আগে মহিম ও পাছে যতীন্দ্র মাষ্টার। যতীন্দ্র মাষ্টার আমাকে আলীশ্বর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে গেল। মহিমও আমার কয়েকজন মুসলমান ছাত্র আমাকে কলমিঞা গ্রামে পৌঁছিয়ে দিল। কলমিঞা গ্রামে একটি বুদ্ধ মন্দির আছে। ভিক্ষুরা কলমিঞা উপস্থিত হলে এই মন্দিরে থাকেন। এই হাজারী বাড়ীর সকলেই সংসার সম্পর্কে আমার নিকটতম আত্মীয়। বিশেষ করে বাল্যকাল থেকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ধনী ডাক্তার। ধনী ডাক্তার আজ আমাকে পাকা বুদ্ধ মন্দিরে না রেখে অতীব যত্ন ও সাবধানে রাখল তার বসতবাটীর গৃহাভ্যন্তরে নিরাপত্তাবোধের প্রেরণায়। সন্ধ্যা রাতে পাক বাহিনীর দু'জন অনুচর হাজারী বাড়ীর সম্মুখস্থ দিঘীর পারে এসে আমার খোঁজ নিতে আরম্ভ করলে ধনী ডাক্তার বলে দিল-তিনি তো আজ বিকালে সীমান্ত অতিক্রম করে চলে গেছেন। এতে অনুচরদ্বয় নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারত সীমান্তে

১৯শে এপ্রিল সোমবার সকালে ধনী ডাক্তার রিক্সাযোগে আমাকে নিয়ে চলল-ছয় মাইল ব্যবধানে ভারত সীমান্তের কাঁঠালিয়া বাজারে। আমরা যখন বাজারে পৌঁছি, তখন বেলা এগারটা। কাঁঠালিয়া বাজারে লাকসামের গণ-প্রতিনিধি জনাব মোঃ আবদুল আউয়াল ও মোঃ জালাল আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার শোচনীয় অবস্থার কাহিনী ব্যক্ত করলে তাঁরা আমাকে দুশ্চিন্তায় বিভ্রান্ত দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন না, ধৈর্য ধরুন। অচিরেই আমাদের সুদিন আসবে। আমরা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে দেশে ফিরে যাব এবং আপনার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণেই স্বাধীনতার উৎসব উদ্‌যাপন করব।

জনাব আবদুল আউয়াল, জনাব জালাল আহমদ ও ভোলইনের এড্‌ভোকেট তাজুল ইসলাম সাহেব ও মানু মিঞার সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলাপ করেছিলাম যে, আমাদের গ্রামবাসী যে আফছরুদ্দিন মিঞা মুক্তিবাহিনীর হাতে ধরা পড়েছেন, তাঁর সম্পর্কে নানা যুক্তি প্রদর্শন করলাম। বললাম-আফছরুদ্দিন মিঞার এই গ্রেপ্তার নিতান্ত সন্দেহজনক এবং অমুলক। তাঁকে যেন সহসা দয়া করে ছেড়ে দেওয়া হয়। তঁকে ছেড়ে না দিলে আমাদের উপর মিথ্যা দোষারোপ আসবার সম্ভাবনা আছে।

আগরতলা উপস্থিতি

তাঁদের সাথে এই আলোচনা করে ঐদিনই বিকালে আমি বাসযোগে আগরতলা চলে যাই। আগলতলায় আমার আপন বলতে আছেন, বুদ্ধ মন্দিরের অধ্যক্ষ গুরু ভাই পুজ্য ভিক্ষু আর্যমিত্র, বিভিন্ন স্কুল কলেজ শিক্ষকরূপে নিযুক্ত অনেক শিষ্য সেবক, সরকারী বে-সরকারী অফিসের কর্মচারীরূপে প্রাক্তন ছাত্র। আর আছেন বৌদ্ধ দায়ক-দায়িকাগণ, বন্ধু বান্ধবগণ। এক রাত্রি বেনুবন বিহারে অবস্থানের পর আমি চলে গেলাম-অভয়নগরে প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যা বিহার নামে ছোট একটি বিহারে। এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা হলেন-আমার প্রধান শিষ্য ডক্টর শ্রী বুদ্ধ দত্ত স্থবির এম, এ (ডবল) বি,টি,ডি,ফিল এবং শাস্ত্রীয় শিক্ষার ত্রিপিটক বিশারদ সুবর্ণপদক প্রাপ্ত। তিনি স্থানীয় রাম ঠাকুর স্কুল কলেজে পালি শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত।

আগরতলায় আমার আগমন বার্তা ছড়িয়ে পড়লে সবাই ছুটে এলেন,-বাংলাদেশ তথা জন্মভূমির মর্মান্তিক খবর নেওয়ার জন্য। খবরে সকলেই ভীষণ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। এখন চারদিক্ক থেকে প্রশ্ন উঠল, আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দেবো কিনা। এই নিয়ে লোকজন ও আমার ছাত্র শিষ্যদের মতানৈক্য দেখা দিল। আমরা বৌদ্ধ সম্প্রদায় কি হানাদার বাহিনীর পক্ষে যোগ দিব - না- বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধার পক্ষে যোগ দিব। এই নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হল চট্টগ্রামে ১৯৭০/৭১ সনে কর্ত্তালা সদ্ধর্মোদয় বিহারের অধ্যক্ষ আমার আচার্যদেব শ্রীমৎ বংশদীপ মহাস্থবিরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্মেলনে। ঐক্যমতে কিছুতেই পৌঁছা গেল না। বিতর্কের সমাধান হল না। একেক জনের একেক মত। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে লাকসাম চলে গেলাম। সেখানেও অনুরূপ পরিস্থিতি। মতের সাদৃশ্য ছিল না। স্বাধীনতার আন্দোলন তখনো ধূমায়িত, প্রজ্বলিত হয়ে উঠেনি। যখন হানাদার বাহিনীর সহিংস তাৎপর্য ও মুক্তিযোদ্ধার তাৎপর্য পুরাদস্তুর আরম্ভ হয়েছিল, তখন আমি আগরতলায় পৌঁছে দেখি- সেখানেও বৌদ্ধেরা দ্বিমত। কেউ জন্মভূমির শান্তি স্বাধীনতার পক্ষে, আর কেউ অত্যাচারী জল্লাদ পাষণ্ডের পক্ষে। আমি তখনো নীরব। আমার বিবেকের অনুকূলে সাড়া পাওয়া গেলনা। সব প্রতিকুলে। কেবল একজন মন্তব্য করলেন, তিনি হচ্ছেন বিশিষ্ট্য রাজনীতিবিদ স্নেহ কুমার চাকমা। তখন আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও সত্যের পক্ষে বিবৃতি দিবই। কিন্তু কারো কাছে প্রকাশ করিনি।

আগরতলা থেকে শুনতে পেলাম, হানাদার বাহিনীর সহচর রাজাকারেরা আমাদের গ্রামের সভ্রান্ত বংশীয় সঙ্গতি সম্পন্ন লোক শশী কুমার দেব নাথ, আজীবন দশের আপদে বিপদের বন্ধু, জনহিতকর ও সমাজ কল্যাণকর কার্যে সহযোগী ছিলেন, সারা জীবন গ্রাম্য ডাক্তারী ব্যবসায় জীবিকা নির্বাহ করতেন, তিনি ও তাঁর ২য় ছেলে প্রমোদ ও তাঁর জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষেত্রমোহন ও তাঁর বড় ছেলে নীলকণ্ঠকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে ডাকাতিয়া নদীর তীরে চারজনকেই হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দিল। আরো শুনলাম আমাদের বরইগাঁও গ্রামবাসী হাকিম আলীকে লাকসাম কুমিল্লা রোড থেকে ধরে এনে কালিকচ্ছ গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের মাঠে পিঠতে পিঠতে মেরেই ফেলল। মারবার প্রাক্কালে তার আর্তনাদে আমার নাম বারবার ধ্বনিত হয়েছে। আমার আত্মীয় বৈকুণ্ঠ কুমার বড়ুয়া নির্বাক প্রত্যক্ষদর্শীরূপে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আমি রাজনীতিজ্ঞ নই, রাজনীতি আমার অনধিগম্য। রাজনৈতিক কোন দলে আমি যোগ দিচ্ছি না। এতকাল যে রাজনৈতিক কোন ক্ষেত্রের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ ছিল না। তথাপি রাজনৈতিক রূঢ় তাৎপর্য থেকে আমার জীবন রক্ষা পেল কই? রাজনীতির উগ্র উন্মাদনার দাপটে মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ নীতি চলছে প্রহসনের রূপে। সুখ-শান্তির জন্য এটাও অরাজকতার নজীরবিহীন রাজত্ব চলছে। তারি বিরুদ্ধে আমি

সত্য কথা বলবই। সত্য কথা বলা মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। সত্যই মানুষের বিকাশ। শাস্ত্রে আছে যা প্রকাশিতব্য বিষয় তা গোপন করলে সত্যের অপলাপ ও মিথ্যার সামিল। আমি অবশ্যই সান্ত্বনা লাভ করব যে হিংসা, হত্যা ও অধর্মের, অত্যাচারে অবিচারের বিরুদ্ধে সত্য কথাই বলেছি। মিথ্যা প্রতারণার আশ্রয় নিইনি। এরূপ সিদ্ধান্তে ২২শে এপ্রিল বুধবার সকালে বিশিষ্ট বৌদ্ধ দায়ক, ভারত সরকারের বিশিষ্ট কর্মচারী শ্রী গোপাল ভুষণ চাকমা মহাশয়কে ডেকে পাঠালাম এবং তাঁর নিকট আমার বিবৃতি দানের সিদ্ধান্ত ও অভিমত ব্যক্ত করলাম। তিনি আকাশ বাণী, আনন্দবাজার, যুগান্তর ও অন্যান্য স্থানীয় পত্রিকার সংবাদদাতা, বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকগণকে খবর দিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিবৃতি

বেলা দশ ঘটিকার সময় প্রাচ্যবিদ্যা বিহারের বারান্দায় বহু পত্রিকার সাংবাদিকগণ এসে ভিড় জমালেন। আমি তাদের সাথে মিলিত হই এবং কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধদের উপর তথা বাঙ্গালী জাতির উপর পাক বাহিনী পরিচালিত পৈশাচিক বর্বরতা লুণ্ঠন, গৃহ-দাহ, নারী নির্যাতন ও গণহত্যার মর্মান্তিক কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি। সাংবাদিক সম্মেলনে আমার প্রদত্ত বিবৃতি, তারপর দিন থেকে ভারতীয় সংবাদপত্রে, পৃথিবীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, বেতার বাণীতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হতে থাকে। এতে বিশ্ব জনমতের সামনে প্রথমবারের মত বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার, অবিচার ও বর্বরতার চিত্র তুলে ধরা হয়। আকাশ বাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এ বিবৃতি বারংবার প্রচারিত হয়। ত্রিপুরার মুখ্য মন্ত্রী মাননীয় শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ, অর্থ মন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য ও চীফ্ সেক্রেটারী প্রভৃতি রাজ পুরুষদের সাথে সাক্ষাৎ করে বৌদ্ধ আশ্রয় প্রার্থীদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী ও নির্মমতার চিত্র তাঁদের সামনে তুলে ধরলাম।

এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে আগরতলার বাংলাদেশ মিশনের পুর্বাঞ্চলীয় বিভাগের বিশিষ্ট নেতাদের সাথে আমার যোগাযোগ হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মরহুম জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী, জনাব মাহবুব আলম চাষী, জনাব আলী আহসান, জনাব এইচ, টি, ডঃ হোসেন, জনাব আকবর আলী খান ও অন্যান্যরা। তাদের সাথে আলাপ আলোচনার পর আমি বাংলাদেশের গণ-হত্যা সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধদের জনমত গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। অধিকৃত বাংলাদেশের পাক বাহিনী গণহত্যা, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের যে বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে, সে সম্পর্কে বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করার সংকল্প গ্রহণ করি।

আমার মন ছুটে গেল অধিকৃত বাংলাদেশে নির্যাতিত অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার, ভিক্ষু বৌদ্ধ জনগণ তথা বাঙ্গালীদের কাছে। আমি ভাবলাম বিশ্ব জনমত ও বিশ্ব বৌদ্ধদের প্রবল আন্তর্জাতিক চাপ ছাড়া এদের বাঁচানোর আজ আর অন্য পথ নেই। অত্যাচারীর অত্যাচারকে বিশ্ব জনমতের ধাক্কা দিয়ে রুখতে হবে। তাই আমি বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামী সহযোগিদের সাথে পরামর্শ করে বিশ্ব-ব্যাপী প্রচারোযোগী এক আবেদন পত্র তৈরী করে অধিকৃত বাংলাদেশে পাক বাহিনীর গণ হত্যার চিত্র, বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস, ভিক্ষু হত্যা ও লুণ্ঠনের কাহিনী তুলে ধরি। বিশ্ব বৌদ্ধ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টির মানসে আমি জাতিসংঘের তদানীন্তন সেক্রেটারী জেনারেল উঃ থান্ট, ব্যাংককস্থ বিশ্ববৌদ্ধ ফেলোশিপের সভানেত্রী রাজকুমারী পুণ-পিসমাই-দিসকুল ও সাধারণ সম্পাদক মিঃ আইয়েম সংঘবাসী, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমাভৈ বন্দরনায়ক এবং পৃথিবীর সব দেশের বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের আঞ্চলিক শাখা ও বৌদ্ধ সমিতিগুলোর কাছে গণহত্যার চিত্র তুলে ধরি, আবেদনপত্র ও টেলিগ্রাম পাঠাই। এতে অধিকৃত বাংলাদেশে বৌদ্ধদের উপর নৃশংস বর্বরতা বন্ধের জন্য হানাদার পাকিস্তান সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির আহবান জানাই। পরে এর ফলশ্রুতি হিসেবে শ্রীলংকার মন্ত্রী ও থাইলেন্ডের বিশ্ববৌদ্ধ ফেলোশিপ অধিকৃত বাংলাদেশে বৌদ্ধদের নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট এর কাছে দাবী জানিয়েছেন।

ইতিমধ্যে অধিকৃত বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগমনকারী সর্বহারা পাঁচজন নেতৃস্থানীয় ভিক্ষু আমার সাথে ১৯৭১ সনের ১২ই মে এক যুক্ত বিবৃতিতে পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী বর্ণনা সম্বলিত আবেদন করেন। আমি ছাড়া অপর চারজন ভিক্ষু হলেন, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সংঘের সহ-সভাপতি মাননীয় শান্তপদ মহাথের, আলীশ্বর বিহারের অধ্যক্ষ পুজনীয় শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ মহাস্থবির, কুমিল্লা কনকস্তুপ বিহারের অধ্যক্ষ ও সম্বোধি সোসাইটির সম্পাদক শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু, কুমিল্লা জিলার আলোকদিয়া বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ সংঘ রক্ষিত ভিক্ষু। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এ খবর বারংবার প্রচারিত হয় এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ত্রিপুরা বাংলাদেশের সংলগ্ন রাজ্য। দু'দেশের মাঝখানে দুর্লজ্ঝ্য পর্বত কিংবা দুস্তীর্ন নদ-নদী নেই। নির্মিত কোন পাঁচিল, আরক্ষা কিছু নেই। ত্রিপুরায় আসলেই বাংলার প্রকৃত পরিস্থিতি অবগত হওয়া ও নানা তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব এইজন্য দেশ বিদেশের বহু সাংবাদিক, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাংবাদিক ও বহু রাষ্ট্রের রাষ্ট্র নায়কের পুনঃপুনঃ আগমন শুরু হল ত্রিপুরা রাজ্যে। বিশেষ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিকট সকলেই বাংলার পরিস্থিতি জানতে চান, লিখে নেন। কিছুদিন এভাবে চলার পর মনে করলাম মুখে আর কত বলব? লিখিত একটি বক্তব্য দাঁড় করিয়ে নিই। এজন্য পাঁচজন ভিক্ষুর যুক্ত

বিবৃতিটি আমার প্রিয় প্রাক্তন ছাত্র বিলোনিয়া হাইয়ার সেকেন্ডারী স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রী দীপায়ণ সিংহ এম, এ (ডবল) বি টি দ্বারা ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে লিথোপ্রেসে ছাপিয়ে নিলাম। অতঃপর যাঁরা দেশ বিদেশ থেকে শরণার্থী শিবির পরিদর্শনে ত্রিপুরায় এসেছেন তাঁদের সামনে নাম স্বাক্ষর করে আমরা এক কপি করে দিয়েছি। যতদিন যায় তত নিত্য নুতন নুতন ঘটনার মর্মস্পর্শী খবর বাংলাদেশ থেকে আসতে থাকে। আমরাও কিছুদিন পর পর আমাদের বিবৃতি পরিবর্তন করে তৈরী করতঃ প্রচার করতে থাকি।

বিশ্ব সাংবাদিক সমাবেশে

বাংলাদেশের অত্যাচার, অবিচার, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন, গণ-হত্যা, লুঠ-তরাজ সম্পর্কে আকাশবাণী, স্বাধীনবাংলা বেতারের প্রচারণা আর ঢাকা বেতার কেন্দ্রের প্রচারণা পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় বিশ্ব জনমত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তখন যথার্থ সত্য অবগতির জন্য একদিন সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের পঁয়ত্রিশ জন সাংবাদিক একসাথে আগরতলা এলেন। বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তাদের সাথে আমরাও সহ-গমন করলাম বিদেশাগত শুভানুধ্যায়ীগণের অভ্যর্থনা করার জন্য আগরতলা বিমান বন্দরে। সঙ্গে নিলাম বিশ্বশান্তি সংস্থা দুর্দশার কাহিনী বর্ণিত আমার আবেদন পত্র সমূহ।

বিদেশী সাংবাদিকগণ আমাদের থেকে বাংলাদেশের বিষয় জানতে উৎসাহ করলে আমি তাদের সামনে বাংলা ভাষায় আমার বক্তব্য পেশ করলাম। আমার বক্তব্য তারা রেকর্ড করে নিলেন এবং আমার বক্তব্যের ইংরেজী ভাষায় দো-ভাষীর কাজ করলেন-জনাব মাহবুব আলম চাষী সাহেব। অতঃপর যখন স্বাক্ষর করে ৩৫ জন সাংবাদিকের হাতে ৩৫ কপি আবেদন অর্পণ করলাম-তাঁরা সবাই সন্তুষ্ট হলেন। আমাদের মিশন কর্মীগণও সন্তুষ্ট হলেন।

কিছুদিন পর বিশ্বের দিকে দিকে এ খবর ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলে বৌদ্ধদেশ সমূহে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সদর দপ্তর ব্যাংককে এ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংস্থাগুলো হানাদার পাকিস্তান সরকারের কাছে বৌদ্ধ ও বাঙ্গালী জাতির নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং অধিকৃত বাংলাদেশে যাতে বৌদ্ধদের নির্যাতন বন্ধ হয় এই মর্মে হানাদার সরকারের কাছে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দাবী করে বিভিন্ন বৌদ্ধ দেশ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয়।

ইতোমধ্যে পাক-বাহিনী ও তাদের সহযোগীগণের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হাজার হাজার সর্বহারা বৌদ্ধ তথা অন্য শরণার্থী শুধু জীবনটুকু নিয়ে দলে দলে সীমান্ত অতিক্রম করতে থাকে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কাঁঠালিয়া, ধনপুর, মাছিমা, সোনামুড়া, উলুবাড়ী, রাঙ্গামাটিয়া, চন্দননগর, আগরতলা প্রভৃতি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে থাকে। বাংলাদেশ মিশন, ভারত সরকার ও আগরতলা বেনুবন বিহারের অধ্যক্ষ পুজ্য ভিক্ষু আর্যমিত্রের সৌজন্যে শরণার্থী ভিক্ষুদের জন্য শিবির প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ থেকে সমাগত ভিক্ষু শ্রমন সকলেই রইলেন বেনুবন বিহারে। আমি রইলাম অভয়নগরস্থ প্রাচ্যবিদ্যা বিহারে।

শরণার্থী ত্রাণ কমিটি গঠন

ক্রমে ক্রমে এই শরণার্থীর সংখ্যা জুন জুলাই মাসে দাঁড়াল বহু হাজার। ঐ সব শরণার্থীদের আশু তত্ত্বাবধানের জন্য শরণার্থী সংকট ত্রাণ কমিটি নামে এক অস্থায়ী সংস্থা গঠন করি। আগরতলা বেনুবন বিহারের অধ্যক্ষ মাননীয় আর্যমিত্র ভিক্ষু এই সংস্থার সভাপতি, মাননীয় পূর্ণানন্দ মহাথের কোষাধ্যক্ষ ও আমি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেম। এই সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্য হলো, যে সর্বহারা বৌদ্ধ শরণার্থী হঠাৎ ভারতে উপস্থিত হয়ে শিবিরে আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে তাদের আহার, ঔষধ পথ্য ও থাকার ব্যবস্থায় সাহায্য করা, পরে তাদের শিবিরে ভর্তির ব্যবস্থা করা।

প্রথমতঃ এই সংস্থা আবেদনপত্র ও রসিদ বই করে কাজ আরম্ভ করেন। আবেদনপত্র ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচারণার ফলে অর্থ সহায় সম্বলহীন দুর্গত জনগণের অনেক উপকার সাধিত হয়। এই সংস্থার কর্ম তৎপরতার বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন সভাপতি মাননীয় ভিক্ষু আর্যমিত্র ও কোষাধ্যক্ষ মাননীয় পুর্ণানন্দ মহাথের। আমি প্রায়শঃ বাহিরে ব্যস্ত থাকায় খুব কমই সহযোগিতা করতে সক্ষম হয়েছি।

বাস্তবাবস্থা অবগত হওয়ার জন্য ও শরণার্থী শিবির পরিদর্শন মানসে হঠাৎ একদিন এলেন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বেতার ও তথ্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীমতি নন্দিনী সৎপতি। আগরতলার আশেপাশে কয়েকটি শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করে তিনি এলেন স্থানীয় বেনুবন বিহার ও বুদ্ধমন্দির দর্শনে। তাঁর সহগমন করলেন ত্রিপুরা রাজ্যের চীফ্ সেক্রেটারী। আমরা শরণার্থী ভিক্ষুরা সবাই শ্রীমতি সৎপতির সাথে সাক্ষাৎ করলাম। শরণার্থীগণের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে আলোচনা চলাকালে কথায় কথায় তিনি এক প্রস্তাব করলেন যে, বাংলাদেশ থেকে সর্বহারা দুঃখ দুর্দশাগ্রস্থ শরণার্থীগণের শিবিরে শিবিরে

পরিক্রমা করে যোগ্য শিক্ষিত ভিক্ষুরা তাদেরকে সান্ত্বনামূলক ধর্মোপদেশ প্রদান করুন। সভায় অনুরোধ জ্ঞাপন করে জিজ্ঞেস করলেন এই প্রস্তাবে আমরা কেউ রাজী আছি কিনা? সভার পক্ষে আমি রাজী হলেম। তাতে মন্ত্রী মহাশয়া বড় সন্তুষ্ট হলেন। বিহার থেকে বিদায় নিয়ে তিনি সেদিনই আগরতলা ত্যাগ করলেন।

শরণার্থী শিবির পরিক্রমা

দুদিন পরে আমি পুজনীয় পুর্ণানন্দ মহাথেরকে সঙ্গী করে বের হয়ে পড়লাম। আগরতলা থেকে দক্ষিণে ৪৫ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত কাঁঠালিয়া বাজারে আশে পাশে যে সব শরণার্থী শিবির প্রতিষ্ঠিত তা থেকে আরম্ভ করে আগরতলা পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী পরিক্রমা করে শরণাপন্ন লোকদিগকে শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে প্রবোধ দান ও বিপদে ধৈর্য ধরার উপদেশ প্রদান করেছি। আমার অপেক্ষা মাননীয় পূর্ণানন্দ মহাথেরর উপদেশের ভঙ্গিমা ছিল বড়ই গ্রহণযোগ্য। বহুলোক এক জায়গায় একত্রে বাস করতে হলে কি করে আচার-বিচার করতে হবে, কোন্ জাতীয় খাদ্য ভোজ্য, আহার বিহারে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে কিরূপে রোগের সৃষ্টি হবে না, আগুনের সংযত ব্যবহারটা কিরূপে হওয়া উচিত। সকাল-বিকাল সন্ধ্যা আহ্নিক ব্রতানুষ্ঠান রীতিমত প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় উপদেশ প্রদান করেছেন। বিশেষ করে গ্রাম্য মহিলা মহলে তাঁর কথা অতীব ফলপ্রসূ হয়েছে। কোন শিবিরে আমাদের বক্তব্য পেশ করার উদ্দেশ্যে কাউকেও একত্রিত করতে হয়নি। অপ্রত্যাশিতভাবে দু'জন প্রবীন সাধু সন্ন্যাসী যখন শিবিরে উপস্থিত হয়েছিলাম, তখন শিবিরের সমস্ত লোকজন চমকিত হয়ে ছুটে এসেছে আমাদের সামনে। প্রত্যেক শিবিরে আমাদেরকে অতি আগ্রহের সহিত তাঁরা অভ্যর্থনা করেছে। এই মহা বিপদকালে আমরা যেন তাদের প্রত্যেকের পরমাত্মীয়। শিবির ত্যাগ করে ফিরবার সময় অনেক শরণাপন্ন লোক কেঁদে ফেলেছে। এরূপে সপ্তাহকাল ব্যাপী শিবিরে শিবিরে গিয়ে যথা কর্তব্য সম্পাদন করে বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্বে আমরা আগরতলা প্রত্যাবর্তন করলাম।

১৯৭১ সন, ১৭ই মে সোমবার বুদ্ধ পূর্ণিমা। আগরতলা বেনুবন বিহারে সে উপলক্ষে উৎসব। তথাগত বুদ্ধ এই মহান তিথিতে জন্ম পরিগ্রহ, বুদ্ধত্ব লাভ ও পরিনির্বাণ লাভ করেন। পরম পুরুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত এই ত্রিধাপুত তিথি বৌদ্ধ জগতে এক পরম পবিত্র মহান দিবস। মহাসমারোহের সহিত সমগ্র বৌদ্ধ জগতে ইহা পালিত হয়। তদ্ধেতু বেনুবন বিহারে পরিকল্পিত উৎসবের সারাদিনের কর্মসূচী হলো এই, অতি প্রত্যুষে ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন, সকাল ৭টায় মহান নীরবতা সহকারে মৈত্রীপূর্ণ

শোভাযাত্রা, ৯টায় বুদ্ধপূজা অর্থাৎ বুদ্ধের মহান গুণানুস্মৃতি। ১১টায় ভিক্ষুসংঘকে পিন্ডদান। সন্ধ্যায় আলোকসজ্জা ও ধর্মসভা। সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দান করলাম আমি। সভাপতিত্ব করলেন-ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শ্রী কৃষ্ণ দাস ভট্টাচার্য মহাশয়। বক্তৃতা করলেন-কুমিল্লা তথা বাংলার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রী রাস মোহন চক্রবর্তী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য সৈয়দ আলী আহসান। মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী হীরালাল চট্টোপাধ্যায় ও এড্ভোকেট শ্রী নিবারণ ঘোষ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ। পরদিন আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী হীরালাল চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করলেন শ্রী নিবারণ ঘোষ। বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি ও শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা করেছি আমি। আরো বক্তৃতা করলেন-ত্রিপুরা রাজ্যের কাষ্টম্ কালেক্টর শ্রী সুভুতি রঞ্জন বড়ুয়া মহোদয়।

আগরতলা বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসবের একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা বৌদ্ধ প্রধান দেশেও বিরল। আমরা সাধারণতঃ মট মন্দির, বিহার চৈত্যে ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপন করে থাকি, কিন্তু আগরতলায় দেখতে পাই প্রতি বৎসর স্বর্গীয় মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর কর্তৃক নির্মিত অতিশয় সুরম্য বিহারে উৎসব পালন করেও তৃপ্তি পান না। পরে আগতলাবাসী রামকৃষ্ণ মিশন, অনাথ আলয়, মহিলাশ্রম, কেন্দ্রীয় কারাগার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও অতিশয় সমারোহের সাথে উৎসব উদ্‌যাপন করে বুদ্ধানুস্মৃতি সাধনায় শ্রদ্ধার অপূর্ব নির্দশন প্রকাশ করেন।

বৈশাখী পুর্ণিমার পরে আবার শিবিরে শিবিরে পরিভ্রমণ করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু আমার অসুস্থতার জন্য তা সম্ভবপর হয়ে উঠলনা। আমার চোখ উঠায় আমি কিছুদিন কষ্ট পেয়েছিলাম। ঐ চোখ উঠা রোগ যে শুধু আমার হয়েছিল তাও নয়। তখন আগরতলায় প্রায় লোকেরই চোখ উঠতে দেখেছি। পুজনীয় শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ মহাথের একাকীই কয়েকটি শিবিরে গিয়ে শরণার্থীগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেকের ধারণা অনেক প্রকার। নানা মুনির নানা মত। মত পরস্পর সামঞ্জস্যহীন। সঠিক সিদ্ধান্তে কিছু বলা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিল না। বাংলাদেশ কি সহসা স্বাধীন হবে, না আদৌ স্বাধীন হবে না? স্বাধীন হতে কি তবে কয়েক বৎসর সময় লাগবে? স্বাধীন না হলে বাংলাদেশে কি ফিরে যেতে পারব? এ সম্পর্কে সকলের মনেই একটা গভীর সন্দেহের রেখাপাত করেছে। আমার মনে প্রশ্ন জাগল, যদি বাংলাদেশ স্বাধীন না হয় অথবা স্বাধীন হতে বেশ কয়েক বৎসর সময়

লেগে যায়, তবে থাকব কোথায়? সারাজীবন আমি যেভাবে জীবন অতিবাহিত করে এসেছি, সে ভাবে যদি থাকতে না পারি, তবে আমার জীবনতো থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের বরইগাঁও গ্রামে বুদ্ধ মন্দির, পালি বিদ্যালয়, অনাথ আশ্রম, সমাজ কল্যাণ সংস্থা, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, লাইব্রেরী প্রভৃতি যে সব সমাজ হিতকর, জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি এবং আজীবন যে ধরণের বহু জনবহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জীবন যাপন করে এসেছি, এখন তা হারিয়ে আজ একাকী কি করে থাকব? এরূপ পরিকল্পনায় আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ বুদ্ধ দত্ত স্থবির, শ্রদ্ধাবান দায়ক শ্রী গোপাল ভুষণ চাক্‌মা, শ্রী সাধন বড়ুয়া ও আমার বন্ধু-বান্ধব শিষ্য সেবকগণের সাহায্য ও সহযোগিতায় আগরতলার দক্ষিণে আমতলীর সূর্যমনি নগরে তথাকার অধিবাসী শ্রী সুধীর চন্দ্র ভট্টাচার্য থেকে ২৮ কানি অর্থাৎ প্রায় ১২ একর সম্পত্তি খরিদ করে লই। এই সম্পত্তি খরিদ করতে যে দলিল করা হয়-তা ব্যক্তিগত কারো নামে খরিদ করা হয়নি। তা দেবোত্তর সম্পত্তিরূপে রেজিষ্টারী করা হয়েছে। দলিলে শুধু সুযোগ যদি পাই, তবে এখানে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবই। আর দেশ স্বাধীন হলে অগত্যা যদি দেশে চলে যেতে হয়, তবে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক বুদ্ধভক্ত লোক আছেন। রাজ্যের সর্বত্র ৩০/৩৫ হাজার বৌদ্ধ আছে। একদিন এই সম্পত্তির উপর ধর্ম, সমাজ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবেই।

তা নিয়ে শুধু ভবিষ্যৎ কল্পনার রাজ্যেই বাস করিনি। ইতোমধ্যে মে মাসের শেষ ও জুনের প্রথম দিকে নুতন খরিদ করা জমিনের উপর খড়ের ছাউনি ও তর্জার বেড়া দিয়ে একটি বসতঘর ও একটি মন্ডপ নির্মাণ করা হয়। মন্ডপে তথাগত বুদ্ধের এক মনোহারী মূর্তি প্রতিষ্ঠা পূর্বক আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বুদ্ধ পূজাদির উৎসর উদ্‌যাপন করা হয়। এতে পাড়া প্রতিবেশী ও শরণাপন্ন লোকের বেশ সমাগম হয়েছিল। পূর্ণিমার পর থেকে এই নব-নির্মিত আশ্রমে শ্রী শীলবন্ত শ্রামন নামে আমার এক বর্ষীয়ান শিষ্য, দু'জন সেবকসহ রীতিমত সেবা সৎকারে ও যত্ন পূর্বক বাস করতে থাকে। মাঝে মধ্যে আমিও তথায় গিয়ে বাস করেছি।

পাক বেতারে আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার

ইতিমধ্যে আমার বিবৃতি যখন দেশ বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচারিত ও প্রকাশিত হতে লাগল। বাংলাদেশের বৌদ্ধ তথা সর্বসাধারণের উপর পাক বাহিনীর গণহত্যা, লুণ্ঠন, নির্যাতন, গৃহদাহ ও অত্যাচার অবিচারের কাহিনী সম্বলিত আমার আবেদন যখন বিশ্বের শান্তি সংস্থাসমূহে এবং বিশ্ব মানবতার নিকট পৌঁছল, যখন আকাশবাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আমার করুণ আকুতি প্রতিদিন ঘোষিত হতে লাগল,

তখন বাঙ্গালী বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে হানাদার বাহিনীর সর্বজন পরিচিত ও এক শ্রেণীর দোসর ঢাকা সহ পাকিস্তানের সকল বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করতে লাগল, পাকিস্তানী বৌদ্ধেরা এখানে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। বৌদ্ধদের উপর কোন অত্যাচার উৎপীড়ন হয়নি, কিংবা বৌদ্ধদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। জ্যোতিঃপাল মহাথের ভারত সরকারের প্ররোচনায় যতসব মিথ্যা প্রচার করছে। বৌদ্ধরা বাংলাদেশে নির্যাতিত, অপমানিত, অপদস্থ ও নিহত হচ্ছে বলে বর্হিবিশ্বে ভারত সরকার ও জ্যোতিঃপাল মহাথেরের যে প্রচারণা তা সম্পূর্ন মিথ্যা। বহির্ভারত হতে আগত পরিদর্শক ও সাংবাদিকগণের নিকট শরণার্থী শিবিরের হিন্দুগণকে বৌদ্ধ বলে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, এভাবে আমার বিরূদ্ধে বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের বিরূদ্ধে কত যে বিষ উদগীরণ করা হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

মিথ্যা মুখোশ খসানোর পালা

ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে এসব মিথ্যা প্রচারণার বিরূদ্ধে বাস্তব সত্যকে প্রমানের উদ্দেশ্যে আমাদের এক প্রস্তাবে ভারত সরকার সম্মত হন। প্রস্তাব করা হল যে, ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন সাব-ডিভিশনের বিভিন্ন শিবিরে আশ্রিত বৌদ্ধ জনগণকে অন্য থেকে পৃথক করে একস্থানে এক শিবিরে এনে স্বতন্ত্রভাবে একত্রিত করা হোক। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত তোতা বাড়ী পাহাড়ে বৌদ্ধদের জন্য স্বতন্ত্র শিবির নির্ধারণ করলে ত্রিপুরা রাজ্যে যত শরণাপন্ন বৌদ্ধ ছিল, সবাইকে তোতাবাড়ী শিবিরে স্থানান্তরিত করা হল। তার ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত সাংবাদিকের কাছে পাক বেতারের প্রচারিত মিথ্যা বিবৃতির মুখোশ খসে পড়ে। আমি পাহাড়ের চূড়ায় বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের ষড়রশ্মি রঞ্জিত পতাকা সর্বক্ষণ উত্তোলন করে রাখতাম। বিরাট এক বৌদ্ধ নামে সাইনবোর্ড ঝুলান থাকত। কোন কোন কামরায় বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। তোতাবাড়ী মাঝে মাঝে বুদ্ধ পূর্ণিমার উৎসব উদ্যাপন করতাম।

সমগ্র বৌদ্ধদিগকে স্বতন্ত্রভাবে একস্থানে সন্নিবেশিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকার ক্ষান্ত হলেন না। অবশেষে এ সিদ্ধান্ত করলেন যে, শরণাপন্ন বৌদ্ধদের থেকে একটি প্রতিনিধি দল এশিয়ার বৌদ্ধ রাষ্ট্র সমূহে প্রেরণ করা প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্তের কয়েকদিন পরই বাংলাদেশ সরকার মুজিব নগর থেকে পূর্বাঞ্চলিক বাংলাদেশ মিশনের অন্যতম কর্মকর্তা জনাব এইচ, টি, ইমাম সাহেবের

নিকট এক টেলিগ্রাম পাঠালেন যে, তিনি যেন কাল বিলম্ব না করে বাংলাদেশ বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি জ্যোতিঃপাল মহাথেরকে আর পার্বত্য চট্টগ্রামের মানরাজা মাননীয় মংপ্রুসেইন চৌধুরীকে মুজিব নগরে পাঠান। এই প্রস্তাব নিয়ে যখন ইমাম সাহেব, ডঃ হোসেন সাহেব (বর্তমান সিলেট চা পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিচালক) ও আকবর আলী খান সাহেব আমার নিকট এলেন, তখন আমি আনন্দের সহিত তাঁদের প্রস্তাবে সম্মত হলেম। মানরাজা প্রথমতঃ সম্মত ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আর বিদেশে গেলেন না। অবশেষে ডঃ হোসেন সাহেব একক আমাকেই মুজিব নগরে পাঠিয়ে দিলেন।

মুজিব নগরে ও নয়া দিল্লীতে

জুলাই মাসের ৭ তারিখ আমি মুজিব নগরের উদ্দেশ্যে আগরতলা ত্যাগ করি। আগরতলা বিমান বন্দর থেকে আমাদের বিমান ছাড়ল সাড়ে বারটায়। বিমানখানি গৌহাটি হয়ে প্রায় সাড়ে তিনটার সময় দমদম বিমান বন্দরে অবতরণ করলে বাংলাদেশ মিশনের এক তরুণ ভদ্রলোক আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর নাম আমি ভুলে গেছি। আমি মুজিব নগরে পৌঁছেই হাই কমিশনার জনাব হোসেন আলী, জনাব আবদুল করিম চৌধুরী, জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর, জনাব মাহবুব আলম চাষী প্রভৃতি কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করি। তাঁরা আমাকে বিদেশ গমনের উদ্দেশ্য, বিদেশে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে অনেক উপদেশ দিলেন এবং কাজের বহু নির্দেশ দিলেন। আমি তখন একটু অসুস্থ ছিলাম। জনাব হোসেন আলী সাহেব বিদেশে অবস্থান কালে আমার শারীরিক দুর্বলতার সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,–আপনার কোন ভয় নেই, আপনার সাথে জনাব এম, আর সিদ্দিকী যাবেন। তিনি চট্টগ্রামের একজন খ্যাতনামা সুজন ব্যক্তি। তাঁর কথায় আমি অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছি, এইজন্য যে, চট্টগ্রাম আমার জন্মভুমি না হলেও আমার গুরুদেবের জন্মভুমি এবং আমার সারা জীবনের শিক্ষাকেন্দ্র ও আবাসভুমি। এক যুক্তিতে আমি চট্টগ্রামকে জন্মভুমি বলেও দাবী করতে পারি। যেহেতু আমার ভিক্ষুকুলে জন্ম চট্টগ্রামেই সম্পাদিত হয়েছে। চট্টগ্রামী আদব কায়দায় ও ভাব-ভাষায় আমি পুরাদস্তুর চট্টগ্রামী। কাজেই চট্টগ্রামীর সাথে আমার ধাতের মিল খুব স্বাভাবিক। মুজিব নগরের কর্মকর্তাদের সাথে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে আমি চলে গেলাম কলকাতা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে। তথায় আমার আচার্যদেব শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির বাস করেন। ঐ রাত্রি তাঁর পাদ-মুলে যাপন করি। পরদিন এগারটায় আচার্যদেবের আশীর্বাদ ও পদধুলি মাথায় নিয়ে আবার এলাম বালাদেশ

মিশনের অফিসে। দিনের বাকী অংশটুকু বাংলাদেশ মিশনের অফিসে বসে বসে কাটালাম। জানতে পারলাম অদ্যই আমাকে দিল্লী পৌঁছতে হবে। জনাব এম, আর, সিদ্দিকী সাহেব আমার জন্য দিল্লীতে অপেক্ষা করে আছেন। রাত্রি নয়টায় দিল্লীগামী বিমান। পূর্বদিন দমদম বিমান বন্দরে যে সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট তরুণ ভদ্রলোকটি আমাকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, তিনিই রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় আমাকে নিয়ে চললেন আবার দমদম বিমান বন্দরে। বিমান বন্দরে পৌঁছার পর এখানে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। জানি না কি কারণে বিমান ছাড়তে এক ঘন্টার উপরে বিলম্ব হয়ে গেল। অতঃপর বিমানে আরোহণ করার পর বিমান যখন তার দু'পাখার উপর ভর দিয়ে ভৈরব রবে আকাশে উঠতে লাগল, তখন আমি তথাগত বুদ্ধের অনন্ত গুণাবলী স্মরণ করে 'সব্বে সত্তা ভবন্তু সুখিত'ত্তা' বলে আসন গ্রহণ করলাম।

বিমান রাত্রি প্রায় ১২ টায় নিউ দিল্লী পালাম বিমান বন্দরে গিয়ে অবতরণ করল। বিমান থেকে নেমে বিশ্রামাগারের দিকে অগ্রসর হতেই দেখি, দু'জন ভদ্রলোক বিমান প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছেন। মুখ মণ্ডল ও চোখের দৃষ্টি ভঙ্গিতে বুঝা গেল তাঁরা বাঙ্গালী। আমার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি পড়তেই একজন আমার দিকে ছুটে এসে আমার কোথেকে আগমন ও নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমার নাম জেনেই বললেন, আসুন আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছি। এই বলে তাঁরা প্রত্যেকের পরিচয় দিলেন। ভাষা প্রয়োগ করলেন বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা। পরক্ষণে শুনি, তাঁদের পরস্পর বাক্যালাপে চট্টগ্রামের পল্লী ভাষা। তাঁদের একজন হলেন, জনাব এম, আর, সিদ্দিকী, অপরজন দিল্লীতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান কর্মকর্তা জনাব শাহাবুদ্দিন। উভয়েরই বাড়ী চট্টগ্রাম। সিদ্দিকী সাহেব ও শাহাবুদ্দিন সাহেব আমাকে নিয়ে চললেন অশোক হোটেলে। অশোক হোটেল রাজকীয় জাঁকজমক ও আরাম আয়াসপূর্ণ। এরূপ হোটেল ভিক্ষুদের অনধিগম্য। পারতো পক্ষে অতি আড়ম্বরপূর্ণ বিলাস ব্যসনে না গিয়ে সাদাসিধে জীবন যাপন ভিক্ষুদের ধর্ম-বিনয়ের বিধান। তচ্ছ্রবনে সিদ্দিকী সাহেব রাত্রি ১ টার সময় আমাকে নয়া দিল্লীর সন্ত নগরস্থ জগজ্জ্যোতি বিহারে পৌঁছিয়ে দিলেন। এই বিহারে আমার বন্ধু ভিক্ষু শ্রীমৎ ধর্ম বিরিয়ো থাকেন। এই বিহার অতীব নয়নাভিরাম দৃশ্যে সুশোভিত। রাজপথ ধারে অনুচ্চ শৈলপাদে প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধধর্মে নবাগত ও নব দীক্ষিত শ্রদ্ধাবান লোক ও চট্টগ্রামের বাঙ্গালী বৌদ্ধরা মিলে এই জগজ্জ্যোতি বিহার প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কয়েকদিন পর আমি এই বিহারের অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীধর্ম বিরিয়োকে সঙ্গী করে নয়াদিল্লীস্থ বিরলা মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ আর্যবংশ স্থবির, কাশ্মীর লাদাক বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ মাননীয় লামা লবজাং ও অশোক মিশনের অধ্যক্ষ কম্বোডিয়ার ভিক্ষু মাননীয় শ্রী ধর্মবরো প্রভৃতির সাথে সাক্ষাৎ করে অধিকৃত বাংলাদেশের দুঃখ-দুর্দশার

কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলাম। শ্রী ধর্ম বিরিয়োর পরামর্শে ও সহযোগিতায় ভারতীয় রাজ্য সভার ভাইস চেয়ারম্যান মাননীয় বি, ডি, খোব্র গার্ডজী, মিঃ বি, পি, মৌরিয়, রেঃ এইচ, এইচ, কুসুম বকুলা, মিঃ সি, সি গোঁহাই, মিঃ এম, সি, পরসর, মিঃ আর, ডি ভান্ডরে মিঃশশি ভুষণ প্রভৃতি বৌদ্ধ এম পি গণের সঙ্গে একে একে মিলিত হই এবং তাঁদের কাছে বাংলাদেশে গণহত্যা, ভিক্ষু হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ, বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস, বুদ্ধমূর্তি ভাঙ্গন ও হরণের এক মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরি। একথাও তাঁদের প্রত্যেকের সাথে আলোচনা করি যে, বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন ও স্বীকৃতি লাভের উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লীতে সহসা একটি ভারতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন আহবান করা নিতান্ত প্রয়োজন। যেহেতু ইতোপূর্বে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অনেক সংস্থার এই উদ্দেশ্যে একাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু ভারতীয় বৌদ্ধগণ কর্তৃক এ যাবৎ এ জাতীয় কোন সম্মেলনের আয়োজন করেন নি। এ প্রস্তাবে তাঁরা সকলেই সম্মত হলেন। অবশ্য তাঁদের সাথে আলোচনা চলাকালে বুঝা গেছে যে তাঁরাও পূর্ব থেকে এ জাতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আসছিলেন। এতদিন তাঁদের অন্তরে প্রবণতাটুকু স্তিমিত ছিল, আজ আমাদের কথায় তা প্রবল বেগে জেগে উঠেছে।

এই আলোচনা ও প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বৌদ্ধ সম্মেলনের দিন তারিখ নির্ধারণ, সভাপতি ও প্রধান অতিথি নির্বাচনকল্পে ১৮ই জুলাই রবিবার বিকাল ৪টার সময় বিরলা মন্দিরে এক সভা আহবান করা হয়। এ সভায় তেমন বেশী লোকজন উপস্থিত হয়নি। দু'জন এম পি, তিনজন ভিক্ষু আর ৫/৭ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। সভায় স্থিরীকৃত হলো যে, ৮ই আগষ্ট রবিবার সর্ব ভারতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন আহূত হবে। এই মহান সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন প্রফেসার আর, ডি ভান্ডারে এম, পি মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহন করবেন ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাননীয় সরদার শরণ সিং মহোদয়। সভায় অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে আমার নামও লিপিবদ্ধ হয়েছিল। সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট বৌদ্ধ প্রতিনিধি এ সভায় অংশগ্রহণ করবেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধ প্রতিনিধিরূপে যোগদান করবেন-জেলা প্রধান বিচারপতি মাননীয় শীলব্রত বড়ুয়া মহাশয়। এরূপ সিদ্ধান্তে অতীব মহাসমারোহের সহিত নিখিল ভারত বৌদ্ধ সম্মেলনের প্রস্তুতি চলতে থাকে।

ইত্যবসরে জুলাই মাসের ২১ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার সময় আমি ভারতের মহীয়সী মহিলা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করি এবং প্রায় আধ ঘন্টা যাবৎ বাংলাদেশ থেকে সমাগত ছিন্নমূল সর্বহারা শরণার্থীদের দুঃখ দুর্দশার কথা বর্ণনা করি। শরণার্থীরা যাতে তাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারেন, সহসা সেই ব্যবস্থা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মহাশয়াকে আকুল আবেদন জ্ঞাপন করি। আমার কিছু হিন্দি, কিছু বাংলা ভাষার বক্তব্য সমাপ্ত হলে এই বলে তিনি আমাদিগকে বিদায়

দিলেন যে, 'সবকে তো একী বাদ হ্যায়, ইস্ লিয়ে ম্যায় সোস্তাহুঁ-ক্যায়া করনা'। আমার সঙ্গে ছিলেন জগজ্যোতিঃ বিহারের অধ্যক্ষ আয়ুস্মান শ্রীধর্ম বিরিয়ো। এই ধর্ম বিরিয়ো চট্টগ্রাম পটিয়া থানার অন্তর্গত কর্তালা গ্রাম নিবাসী ভিক্ষু। তিনি হাই কমিশনার হোসেন আলী সাহেব, মোঃ শাহাবুদ্দিন সাহেব (বর্তমান বাংলাদেশ জাতীয় ডাক্তার মোঃ নুরুল ইসলাম সাহেবের ছোট ভাই) প্রভৃতি বাংলাদেশ মিশনের সাথে সহযোগিতা করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যে অবদান রেখেছেন তার তুলনা নাই। যেদিন হাই কমিশনার হোসেন আলী সাহেব বাংলাদেশের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেছিলেন-সেই দিন বাংলাদেশের গণহত্যা, লুটতরাজ, অত্যাচার অবিচারের প্রতিবাদে যে পাঁচজন লোক অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেছিলেন– তন্মধ্যে শ্রীধর্ম বিরিয়ো ভিক্ষু ছিলেন অন্যতম।

ইতোমধ্যে মুজিব নগরে অবস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আমাকে বাংলাদেশের স্বপক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিকল্পে ও স্বীকৃতি লাভের সন্ধানে এশিয়ার বিভিন্ন বৌদ্ধ রাষ্ট্রে প্রতিনিধিরূপে পাঠাবার সকল প্রকার ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রতিনিধি পাঠাবার কথা ছিল জনাব এম, আর, সিদ্দিকী সাহেবকে। তাঁকে জরুরী কাজে হঠাৎ আমেরিকায় পাঠাতে হয়েছে বলে এখন আমাকে প্রতিনিধি দলের নেতারূপে মনোনীত করলেন। আমার সঙ্গে থাকবেন হাইকোর্ট এডভোকেট ফকির সাহাবুদ্দিন আহমদ সাহেব যিনি বর্তমানে বাংলাদেশ হাইকোর্টের এটর্নি জেনারেল। বাংলাদেশের পক্ষে যাঁরা বিদেশে প্রচারণার জন্য গিয়েছেন, ভারতীয় পাসপোর্টে সকলের নাম বদলাইয়ে দিয়েছেন। আমি কিন্তু আমার নাম বদলাইয়ে অন্য নামে বিদেশে যেতে রাজী হইনি। শ্রীলংকা, বার্মা, থাইল্যান্ড এর প্রায় বড় বড় ভিক্ষুরা আমার পরিচিত। বিশেষতঃ আমি ভিক্ষু বেশধারী। তখন আমি ইহার কারণ বুঝতে পারিনি। তবু আমার লিখার নমুনা হল শুধু জ্যোতিঃপাল, মহাথের শব্দটি বাদ। তাতে আমি রাজী হয়েছিলাম।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ্বের বিভিন্ন বৌদ্ধ দেশ সফর

নিখিল ভারত বৌদ্ধ সম্মেলনের সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত। ৬ই আগষ্ট শুক্রবার সকাল হঠাৎ বাংলাদেশ মিশন থেকে লোক এসে খবর দিলেন ৭ই আগষ্ট শনিবার অর্থাৎ আগামী কল্য নয়টার সময় ফকির শাহাবুদ্দিন আহমদ সাহেবকে সঙ্গে করে আপনাকে কলম্বোর উদ্দেশ্যে বোম্বাই রওনা হতে হবে। পাসপোর্ট, ভিসা, হেল্‌থ সার্টিফিকেট ইত্যাদি বিদেশে যাওয়ার যত রকম দলিলপত্র সব প্রস্তুত। হঠাৎ এ খবরে অবাক হলেও উপেক্ষা করার যো ছিল না। যেহেতু যে উদ্দেশ্যে নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে দিল্লী এসেছি।

আগষ্টের ৭ তারিখ শনিবার সকাল ৮টায় নয়াদিল্লী জগজ্যোতিঃ বিহার থেকে জনাব শাহাবুদ্দিন সাহেব ও আমি বের হয়ে পড়লাম। সঙ্গে চললেন বন্ধুবর শ্রীধর্ম বিরিয়ো ভিক্ষু। বিদেশে বিতরণের জন্য আমাদের সঙ্গে দিলেন বোঝাই করা বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য, বিভিন্ন প্রকারের পুস্তিকা, ফটো ইত্যাদি। ঠিক সাড়ে ৯টায় আমরা বোম্বাইগামী বিমানে আরোহণ করলাম। জেট বিমান আমাদেরকে তার বিরাট কুক্ষিতে ধারণ করে দৈত্য গতিতে সোয়া ঘন্টায় বোম্বাই গিয়ে পৌঁছল। বোম্বাই থেকে সঙ্গে সঙ্গে সিংহলগামী সম্পর্কিত বিমান ছিল না। সিংহলের উদ্দেশ্যে বোম্বাই বিমান বন্দর থেকে বিমান ছাড়বে বিকাল ৪টায়। মাঝে ৪/৫ ঘন্টার মত সময় পাওয়া গেল। ইত্যবসরে শাহাবুদ্দিন সাহেব একটি টেক্সী ভাড়া করে আমাকে নিয়ে চললেন। এ চলার বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না। তবে বোম্বাই সমুদ্রকুলে অবস্থিত মহানগরী দেখবার অনেক সুশোভিত দৃশ্য আছে। তম্মধ্যে কয়েকটি স্থান দেখে আসবো, এই উদ্দেশ্য নিয়ে রওনা হলেম মহা সমুদ্রের উপকুল ধরে। সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে অনেক দুর অগ্রসর হলেম। বেশী কিছু দেখবার সময় সুযোগ ছিল না। অসীম সমুদ্রের দৃশ্য দেখেই সেখান থেকে ফিরে এলাম। ফিরে আসার সময় রাস্তায় কয়েকবার মহাসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের অগ্রচ্ছটা আমাদের গাড়ীর উপর দিয়ে অতিক্রম করল। তাতে আমরা কিছুটা ভিজে গেলাম এবং বিপুল আনন্দ উপভোগ করলাম। এদিকে আমার আহারের সময়। বিমান বন্দরের এক হোটেলে ভোজনকৃত্য সমাপন করলাম এবং ২/৩ ঘন্টা বিশ্রাম করলাম বিমানের সময় প্রায় আসছে। শাহাবুদ্দিন সাহেব পাসপোর্ট, হেলথ সার্টিফিকেট ইত্যাদি প্রদর্শন করলেন। অতঃপর বিকাল ৪ টার সময় যেই বিমানে আমরা আরোহন করলাম,-তা হচ্ছে সিলোন এয়ার লাইন, বিরাট সে বিমান। তাতে আরোহন করার সঙ্গে সঙ্গে বিমান অন্ততঃ দুইশত আরোহীকে বক্ষে

ধারণ করে বিকট শব্দে গগন-মণ্ডলে উঠতে লাগল। উপরে অসীম অন্তরীক্ষ নিম্নে অনন্ত পারাবার। দুই অনন্তের মাঝখান দিয়ে আমাদের হাওয়াই যান হাওয়ার মত ছুটল উত্তরপূর্ব দিশাভিমুখে।

শ্রীলংকা উপস্থিতি ও প্রচার তৎপরতা

বিকাল সাড়ে পাঁচটায় বিমান সিংহলের বন্দর নায়ক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করলো। পাসপোর্ট ভিসা ইত্যাদি দলিলপত্র প্রদর্শন করে বিদেশীর কর্তব্য সেড়ে নিতে রাত্র হয়ে গেল। কলম্বো মহানগরী বিমান বন্দর থেকে বিশ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। আমরা রাত্রি সাড়ে সাতটায় গিয়ে পৌঁছলাম কলম্বো মহানগরীতে এবং আমাদের বাসস্থান এর ব্যবস্থা হল গ্রীন হোটেলে। সিংহলে পাঁচদিন অবস্থানকালে এদেশের নেতৃস্থানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে, জাতীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা ও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে মিলিত হই এবং তাঁদের নিকট বাংলাদেশের গণহত্যার সঠিক চিত্র তুলে ধরলাম। বৌদ্ধদের উপর চরম নির্যাতন চলার ফলে হাজার হাজার বৌদ্ধদের ভারতে শরণার্থীরূপে আশ্রয় নেওয়ার খবর যে প্রচারিত হয়েছে তার প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করলাম।

আমরা সিংহলে পৌঁছার অনেকদিন আগেই সিংহলে বাংলাদেশের পক্ষে কর্মতৎপর Cylon Committee for human rights in East Bengal নামক যে শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়, তার চেয়ারম্যান হচ্ছেন, জাতিস!ংঘে সিংহলের প্রাক্তন স্থায়ী প্রতিনিধি বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা মিঃ সেনাপথ গুণ বর্দ্ধন এবং সাধারণ সম্পাদক মিঃ অমর দাস ফার্নেন্ডো। আমরা সিংহলে উপস্থিত হলে মিঃ অমর দাস ফার্নেণ্ডো তাঁর বাস ভবনে দুইবার কমিটির সম্মেলন আহবান করেন। আমরা এই সম্মেলনে আলোচনাকালীন অধিকৃত বাংলাদেশের পাক-হানাদারের আক্রমন থেকে উদ্ভুত ভয়াবহ অবস্থার কথা বিশদভাবে বর্ণনা দিয়েছি।

৮ই আগষ্ট, রবিবার আমি গ্রীন-হোটেল ত্যাগ করে চলে গেলাম বজিরারাম নামক মহা বিহারে। যেই বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীমৎ নারদ মহাথের। শাহাবুদ্দিন সাহেব হোটেলেই রইলেন। সময়ের সঙ্কীর্ণতা বিবেচনা করে ৯ তারিখ থেকে দুইজন দুই লাইনে কাজ করতে শুরু করলাম। শাহাবুদ্দিন সাহেব গেলেন প্রাক্তনমন্ত্রী, বর্তমান মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতৃমহলে আর আমি গেলাম বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন সংস্থার প্রধান কর্মকর্তা বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতা ও ধর্মগুরু মহলে। অধিকৃত বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগণ ও বৌদ্ধদের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করার জন্য যে সব বিশিষ্ট বৌদ্ধ ও নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কলম্বোর থেকে ৭৫ মাইল উত্তরে

কেন্দ্রীয় মাল ওয়াট মহা বিহারের অধ্যক্ষ মহানায়ক মহাথের মাননীয় শ্রীমৎ সুমন সিদ্ধার্থ, বিশ্ব বিখ্যাত বৌদ্ধ মনীষী জার্মান ভিক্ষু জ্ঞান পোনিকা মহাথের। শ্রীলংকা বৌদ্ধ কংগ্রেসের সভাপতি মাননীয় বিপুলসার থের, বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোশিপের সিংহল কর্মকর্তাবৃন্দ। আমার সঙ্গে ছিলেন সিংহলে পালি, বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষাকামী ভারতীয় ভিক্ষু শ্রীমৎ জ্ঞান জগৎ, ভারতীয় দুতাবাসের লোক মিঃ তরিৎ কান্তি সেন (বাঙ্গালী)। তাঁদের সহযোগিতায় পুর্বোক্ত মহান নেতৃবর্গের সাথে আলোচনাকালে আমি অধিকৃত ও বাংলাদেশের গণহত্যা, অত্যাচার, নৃশংসতা বন্ধের দাবী জানিয়ে পাকিস্তান হানাদার সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করার জন্য আবেদন জানিয়েছি। আরো জানিয়েছি বাংলাদেশের বর্তমান স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রতিটি বাঙ্গালীর বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও স্বাধীনতা লাভের সংগ্রাম। পরদিন সিংহলের পত্র-পত্রিকায় আমার কেন্ডি ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। জনাব শাহাবুদ্দিন আহমদ সিংহলের প্রাক্তন প্রধান অমাত্য মিঃ ডেডলি সেনানায়ক, মিঃ সেনাপথ গুণবর্দ্ধন মিঃ চন্দ্র শেখর প্রভৃতি কয়েকজন মন্ত্রীর সাথে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করেন। তা'ছাড়া সর্বশেষ দিন আমি ও শাহাবুদ্দিন সাহেব গণপরিষদ ভবনে গমনপূর্বক কতিপয় মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারী সদস্যের সাথে মিলিত হয়ে অধিকৃত বাংলাদেশ গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা সাফল্য সম্পর্কে যথার্থ চিত্র তুলে ধরলেন এবং সিংহলের উপর দিয়ে পাকিস্তানী সামরিক জান্তা বিমান বাংলাদেশে যাতায়াত বন্ধ করার আবেদন জানালাম। ফলে আমার ও শাহাবুদ্দিন সাহেবের উপস্থিতিতেই পাঁচজন মন্ত্রীর স্বাক্ষরিত অনুরোধ জ্ঞাপক এক যুক্ত বিবৃতি পাকিস্তানী বিমানের কলম্বো বন্দরে অবতরণ বন্ধ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মিসেস্ বন্দর নায়কের নিকট এক বিনীত আবেদন দাখিল করেছিলেন। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, জলস্থল অন্তরীক্ষ পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর জন্য যাতায়ত বন্ধ। শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের একটি কোণা খোলা ছিল। এই সুযোগে পাকিস্তানী বিমান কলম্বো হয়ে ঢাকা যাতায়ত করত। তারা বলত-এই বিমান যোগে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর জন্য খাদ্য সামগ্রী আনা নেওয়া করত। একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আসলে আনা-নেওয়া করত ৫০০ (পাঁচ শত) করে সৈন্য এবং যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র। পাকিস্তানী বিমানের জ্বালানী কলম্বো বন্দরে মিসেস বন্দর নায়ক তৎপূর্বেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আমরা থাইল্যান্ডগামী বিমানে উঠেই পত্রিকায় লক্ষ্য করলাম যে, আন্তর্জাতিক বন্দর নায়ক বিমান বন্দরে পাকিস্তানী বিমানের অবতরণ বন্ধ। বাংলাদেশের সর্বদিকের আনাগোনার পথ যখন রুদ্ধ, বর্হিবিশ্বের সাথে যোগাযোগ যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখন নিয়াজী সাহেবের আত্ম সমর্পণ ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। তথাপি নিয়াজী সাহেব কয়েকঘন্টা সপ্তম নৌবহরের জন্য প্রত্যাশায় অপেক্ষমান ছিলেন। এদিকে ভারতীয় বীর সেনানী অরোরা ঢাকার আকাশে আকাশে উড়ে নিয়াজী সাহেবকে লক্ষ্য করে ঘন্টার পর ঘন্টা বলতে ছিলেন, নিয়াজী-তুমি আর আমি বাল্যকালাবধি পরস্পর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোমার পুত্র-কন্যা আত্মীয় স্বজন আছে, আমারো

পুত্র-কন্যা আত্মীয় স্বজন আছে। তোমার দশদিক বন্ধ করে ফেলেছি। তোমার আর কোন উপায় নেই। অনর্থক মৃত্যুমুখে পতিত হয়োনা, আত্মসমর্পণ কর। সুতরাং ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ।

এভাবে পাঁচদিন কাজ করার পর Ceylon Committee for human rights in East Bengal কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মিসেস জয়া বর্দ্ধনার বাসভবনে সিংহল ত্যাগের প্রাক্কালে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বাংলাদেশে গণহত্যা ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সঠিক চিত্র আমরা তুলে ধরেছি। সিংহল ত্যাগের প্রাক্কালে যথার্থ সত্যের পূর্ণ বিবরণ আমরা নিঃসংশয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠেই প্রচার করেছি। পরদিন সিংহলের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এই সম্মেলনের বক্তব্য ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য সম্বলিত বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা সিংহলের জননেতা, বৌদ্ধ নেতা ও সাংবাদিকের কাছে বিলি করে আমরা ১১ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১১ টায় সময় থাইল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে সিংহল ত্যাগ করি।

থাইল্যাণ্ডে ব্যাপক কর্ম ব্যস্ততা

কলম্বো থেকে যেই বিমানযোগে আমরা ব্যাংককে গমন করি তা হচ্ছে ফ্রান্স এয়ারওয়েজ। ফ্রান্স থেকে কলম্বো, ব্যাঙ্কক হয়ে জাপানগামী এই বিমান। আমরা বিমান থেকে অবতরণ করেই দেখি বাঙ্গালী ভিক্ষু শ্রী বসুমিত্র, শ্রী সোমানন্দ, দু'জন থাই ভিক্ষু আর একজন অষ্ট্রেলিয়ান ভিক্ষু এই পাঁচ জন আমাদিগকে অভ্যর্থনা করতে এসেছেন। আর এসেছেন ভারতীয় দুতাবাসের একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক। ভদ্রলোক শাহাবুদ্দিন সাহেবকে ব্যাঙ্ককের এক অভিজাত হোটেলে নিয়ে তাঁর অবস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেন। আয়ুস্মান সোমানন্দ ও বসুমিত্র আমাকে নিয়ে গেল থাইল্যাণ্ডের অতি প্রসিদ্ধ সংঘারাম মার্বেল টেম্পলে। পরদিন আয়ুস্মান বসুমিত্রের ও সোমানন্দের সহায়তায় আমি বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সদর দপ্তরে গিয়ে সভানেত্রী রাজকুমারী পুন পিসমাই দিস্কুল ও সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ আইয়েম সংঘবাসীর সাথে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে মিলিত হই। তাঁদের সাথে আলোচনাকালে আমি অধিকৃত বাংলাদেশে নারকীয় ভয়াবহতা ও জনগণের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে এক মর্মস্পর্শী বর্ণনা দান করি। বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সদর দপ্তরে জ্ঞাপন করলাম যে, মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক চরমতম বিপর্যয়ে বাংলাদেশ থেকে হাজার হাজার বৌদ্ধ তাদের সর্বস্ব হারিয়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাক সামরিক বাহিনীর আক্রমনে অনেক বুদ্ধমন্দির বিহার ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছে, অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষুকে হত্যা করা হয়েছে।

এমনকি নবুতিপর জরাগ্রস্ত সংঘরাজ মহামান্য শ্রী অভয়তিষ্য মহাথের ও পরম সাধক শ্রীধর্ম বিহারী স্থবিরের উপর পর্যন্ত সেই নর পিচাশেরা দৈহিক নির্যাতন চালিয়েছে। অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস ও হরণ করা হয়েছে এবং বৌদ্ধ এলাকায় হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগ অনবরত নির্মমভাবে হত্যা করেছে। প্রতিদিন বাংলাদেশ থেকে ভারতে আগমনকারী অসংখ্য শরণার্থীদের মারফৎ এসব মর্মস্পর্শী খবর এখনো আসছে। বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রতৃত্ব সংঘের প্রধান কার্যালয় ব্যাঙ্কক সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল এ, এম, সংঘবাসী আমার পক্ষ হতে বিশ্বের বিভিন্ন বৌদ্ধ রাষ্ট্রে বাংলাদেশ সম্পর্কে যোগাযোগ ও প্রচারণা শুরু করলেন। যেমন চীন, জাপান, হংকং, কোরিয়া , ভিয়েতনাম, লাউস, কাম্বোডিয়া, এশিয়া বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলনের প্রধান কার্যালয় মংগোলিয়া। রাশিয়ার উলান উদে, মস্কো, নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রচার করে বাংলাদেশের দুঃখ দুর্দশার প্রচারণা করেছিলেন। পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন। আমাকে অফিসে বসাইয়ে রেখে তিনি নিজেই সব করলেন। এতদ্ব্যতীত সেপ্টেম্বর মাসের World Fellowdhip of Buddhist এর Monthly Review-র প্রথম কভারে আমার, শাহাবুদ্দিন সাহেব, প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারী ফটোসহ বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেছেন। সমগ্র বৌদ্ধ জগতে পাঠিয়েছেন। সেক্রেটারী জেনারেল সংঘবাসী আমার বহু বৎসর আগের থেকে অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বিশ্ব বৌদ্ধ ফেলোশিপকে এ ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য আবেদন করলে ফেলোসিপ অতঃপর তদানীন্তন পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বৌদ্ধদের নিরাপত্তার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করে চিঠি দিয়েছেন। বৌদ্ধ প্রধান দেশ থাইল্যান্ড অবস্থান করে আমি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও নেতাদের সাথে দেখা করে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা ও বৌদ্ধ জনগণের উপর নিপীড়ন সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াকিরহাল করেছি। যদিও অধিকৃত বাংলাদেশ থেকে হানাদার চক্র "বৌদ্ধরা পাকিস্তানে সুখে শান্তিতে আছে। বৌদ্ধরা দেশ ত্যাগ করেনি" ইত্যাদি বক্তব্য বিশ্বব্যাপী প্রচার পূর্বক বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে, আমি দৃঢ়তার সাথে সেই মিথ্যা প্রচারের মোকাবিলা করেছি এবং বৌদ্ধ নিপীড়নের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। বাঙ্গালীদের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী যাঁদের কাছে বর্ণনা করেছি তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে থাইল্যান্ড বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি ও থাইল্যাণ্ড সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি (পরবর্তীকালে যিনি থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী) মহামান্য সন্ন ধর্মশক্তি, থাইল্যাণ্ডের মহামান্য ভিক্ষু কুল শ্রেষ্ঠ সংঘরাজ, মহামুকুট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাননীয় ফ্র-শাসন শোভন ধর্ম বিষয়ক বিভাগের মন্ত্রী মহামান্য ফ্র-ব্রহ্মমনি, মার্বেল টেম্পলের অধ্যক্ষ মাননীয় ফ্র-ধর্মকীর্তি শোভন, থাই ধর্ম বিষয়ক বিভাগের মহাপরিচালক ও ওয়াট পাক নামের অধ্যক্ষ মহামান্য ফ্র-ধর্মাধিরাজ মহামুনি।

১৬ই আগষ্ট, নির্ধারিত যে বিমান জাপান থেকে ব্যাংকক এসে পুনঃ জাপান প্রত্যাবর্তন করবে, সেই বিমানযোগেই আমরা জাপান পৌঁছাব, এ ছিল আমাদের প্রোগ্রাম। কিন্তু ১৬ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় আমরা জাপানের উদ্দেশ্যে ব্যাংকক বিমান বন্দরে এসে জানতে পারলাম যে, কোন কারণে আজ এই বিমান জাপান থেকে আসবেনা। ইহা বাতিল। এদিকে আমাদের ভ্রমণ প্রোগ্রাম ব্যতিক্রম করলে সমগ্র প্রোগ্রাম এত আঁটসাট যে, একটি প্রোগ্রাম ব্যতিক্রম করলে সমগ্র প্রোগ্রাম উল্টে যায়। এমতাবস্থায় শাহাবুদ্দিন সাহেব অনেক চেষ্টা করে বিমান কর্তৃপক্ষের সাথে বোঝা পড়া করে ব্যবস্থা করলেন, যে জাপানী বিমান ফ্রান্স থেকে ব্যাংকক হয়ে জাপানে ফিরবে, তাতে যেন আমাদিগকে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বিমান কর্তৃপক্ষ তাই করলেন।

এবার সূর্যোদয়ের দেশে

অবশেষে বেলা তিনটার সময় ফ্রান্স থেকে প্রত্যাগত জাপান এয়ার ওয়ের বিমানে আহোরণ করে রাত্রি ৮টার সময় দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা জার্নির পর টোকিও আন্তর্জাতিক নারিতা বিমান বন্দরে অবতরণ করলাম। ছোট বেলা থেকে শুনে আসছি জাপান সৌন্দর্যের অমরাপুরী রাজ্য। আজ সত্যই তা প্রত্যক্ষ করলাম।

বিমান বন্দরের বহিঃ প্রাঙ্গণে এসে দেখি, আমাদিগকে অভ্যর্থনা করার জন্য আজ আর কেউ আসেনি। এই বিদেশ বিভূঁইয়ে আমরা অজ্ঞাত অপরিচিত অবস্থায় কোথায় যাই? শাহাবুদ্দিন সাহেব এখানেও অনেক চেষ্টা তদ্বির করে জাপানের অভিজাত হোটেল ওতানিতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করলেন। অতঃপর রাত্রি সাড়ে দশটায় টেক্সীযোগে আমরা হোটেল ওতানিতে চলে গেলাম।

হোটেল ওতানির কোনরূপ বর্ণনা দেওয়া আমরা ভাব-ভাষা ও সাধ্যের অতীত। শুধু দুর্বল কথায় এটুকু বলতে পারি সৌন্দর্য, গাম্ভীর্য্য, গঠন প্রণালীর পরিপাট্যে, স্থাপত্য নৈপুন্যে, নানাবিধ নয়নাভিরাম দৃশ্যে এবং মনোমুগ্ধকর বৈশিষ্ট্যে শাস্ত্রে বর্ণিত স্বর্গের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পাঁচ তলায় শাহাবুদ্দিন সাহেব রইলেন ৪৭নং কক্ষে আর আমি রইলেম ৪৫নং কক্ষে। আমাদের জাপান পৌঁছার অনেক আগেই বাংলাদেশের পক্ষে জাপানে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ লিবারেশন কমিটি নামে এক সংস্থা গঠিত হয়েছিল এই সংস্থার চেয়ারম্যান হলেন, টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের এশিয়া আফ্রিকার ভাষা সম্পর্কিত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ টি নারা এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন

মোঃ জালাল আহমদ নামে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক। এই বাংলাদেশ লিবারেশন কমিটির সহযোগিতায় আমরা জাপানে কাজ করতে আরম্ভ করলাম।

বাংলাদেশ লিবারেশন কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ নারার বাসভবনে একদিন এবং সাধারণ সম্পাদক আহমদের বাসভবনে একদিন এই দু'দিন কমিটির কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বাংলাদেশ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনা হয়। এই দীর্ঘ আলোচনায় অধিকৃত বাংলাদেশের গণহত্যা অগ্নি সংযোগ, নির্যাতন, লুট-তরাজ ও ধ্বংসের মর্মস্পর্শী বিশদ বিবরণ প্রদান করেন জনাব শাহাবুদ্দিন সাহেব। এখানে যাবতীয় আলোচনা বাংলাভাষার মাধ্যমেই হয়েছিল। এখানে প্রায় সকলই ছিলেন বাঙ্গালী। চেয়ারম্যান ডঃ নারা জাপানী হলেও তিনি বাংলা ভাষার অতীব অভিজ্ঞ। তিনি শান্তি নিকেতনের ছাত্র। স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপক্ষে ব্যাপক জনমত গঠনের কার্যক্রম অনুসারে পরদিন আমরা জাপানের বৃহত্তম দৈনিক ইংরেজী পত্রিকা Mairichi Daily News অফিসে গমন পূর্বক পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিকগণের সাথে সাক্ষাৎ করে হানাদার পাক বাহিনীর সকল প্রকার অত্যাচারের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছি। পরদিন পত্রিকায় এই সাক্ষাৎকার এর বিস্তারিত বিবরণ ও আমাদের উভয়ের ফটো প্রকাশিত হয়। অতঃপর জাপানী ভাষার প্রসিদ্ধ পত্রিকা–"চুগাই নিপ্প"র প্রধান সম্পাদক 'হোটেল ওতানিতে' এসে আমাদের সাথে মিলিত হন এবং বাংলাদেশ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যান। দু'দিন পরে এই সাক্ষাৎকারের সবিস্তার বিবরণ এবং আমাদের ফটো সহ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তারপর আমরা জাপান বুদ্ধ এডোরশন সমিতির ডিরেক্টর মাননীয় রিরি নাকা-য়ামার সাথে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছি। পাক হানাদার বাহিনীর বাঙ্গালী তথা বৌদ্ধদের উপর ব্যাপক নৃশংসতা চালাচ্ছিল একথা তাঁকে জানান হলে মাননীয় রিরি নাকায়ামা তা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেন। তিনি হানাদার বাহিনীর সহচর এক শ্রেণীর বাঙ্গালী বৌদ্ধের প্রভাবে পড়েই আমাদের আকুল আবেদন বিশ্বাস করতে রাজী ছিলেন না। রিরি নাকায়ামা বলেন যে, তিনি স্থানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট "বৌদ্ধেরা সম্পূর্ণ নিরাপদে আছেন" বলে জানতে পেরেছেন। মাননীয় নাকায়ামার উল্লেখিত খ্যাতনামা বৌদ্ধ ভিক্ষু হচ্ছেন যিনি নিজেকে বৌদ্ধ সংস্থার সভাপতি রূপে ঘোষণা করেন। হানাদার বাহিনীর প্রভাবে পড়ে মানবতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে সেই স্বঘোষিত সত্যের অপলাপ করেছেন। এই নিয়ে শাহাবুদ্দিন সাহেবের সঙ্গে বহু কথা কাটাকাটির পর তাঁকে বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ছবি প্রদর্শন করা হলে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন এবং বলেন, আমি ঢাকায় পত্র দিয়ে দেখব এই বলে আমাদিগকে বিদায় দিলেন।

কোমোজেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাননীয় ডঃ য়াসুয়াকি নারা আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। টোকিও মহানগরীতে কার্যব্যপদেশে আমাদের দৈনন্দিন যত

আনাগোনা করতে হয়েছে সর্বক্ষেত্রে অধ্যাপক নারার গাড়ী যোগেই হয়েছে। তিনি আমাকে কয়েকটি বুদ্ধ মন্দিরে নিয়ে গেলেন এবং টোকিও মহানগরীতে সর্বাধিক উচ্চ বেল টাওয়ার দর্শনে ও তাতে আরোহণে সাহায্য করেছেন।

টোকিও মহানগরীতে আমরা আরো যে সব জননেতা, রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিশীল নেতৃস্থানীয় লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে কার্যকরীভাবে আলোচনা করেছি-তাঁরা হলেন জাপান আফ্রো এশীয় সংহতি কমিটির ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য মিঃ ফমিকুবো, টোকিও মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ কে, এ, কাশি ওয়াসী, নিচি ইন্দো সর্বোদয় সমিতির সভাপতি মিঃ কোজি ওকামাঠে এবং এটোম ও হাইড্রোজেন বোমার বিরুদ্ধে জাপান কাউন্সিলের পরিচালক মাননীয় ভিক্ষু গ্যায়ৎসো সাতো। শাহাবুদ্দিন সাহেব বলেন,-এ যাবৎ যত রাজনৈতিক পুরুষের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে-, সর্বাপেক্ষা সুক্ষ্ম রাজনীতি ও দুরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া গেছে, এই ভিক্ষু সাতোর মধ্যে। বৌদ্ধ ভিক্ষু হলেও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে।

এইভাবে টোকিওতে সাতদিন কাজ করার পর আমরা ২২শে আগষ্ট রবিবার সকাল দশটার সময় জাপান ত্যাগ করে হংকং পৌঁছি। সেইদিনই হংকং বিমান বন্দর থেকে শাহাবুদ্দিন সাহেব আমার থেকে বিদায় নিলেন এবং আমি হংকং থেকে নয়াদিল্লী চলে আসি। ফকির শাহাবুদ্দিন সাহেব হংকং, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর ভ্রমণ করে দুই সপ্তাহ পর নয়াদিল্লী এসে পৌঁছেন। ফকির শাহাবুদ্দিন সাহেব আর আমি দুইজন দুই স্তরের লোক। স্তরের ব্যবধান অনেক। আমার মধ্যে অসুবিধার অনেক কারণ বিদ্যমান থাকলেও তাঁকে বিদেশের বাড়ীতে আমাকে নিয়ে কোনরূপ অসুবিধা বোধ করতে দেখিনি। দেখেছি আমার প্রতি সর্বদা আপনজনের মত তাঁর সৌজন্য ও বিনয় নম্রভাব। তাঁর অমায়িক স্বভাবই আমার সকল দুর্বলতা সহ্য করেছে। এজন্য তাঁর প্রতি আমার অজস্র ধন্যবাদ। তিনি আজ ইহলোকে নেই।

আমাদের প্রচার সাফল্য

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে প্রচারণার উদ্দেশ্যে মাত্র দুই সপ্তাহের ভ্রমণে সিংহল, থাইল্যাণ্ড ও জাপান এই তিনটি বৌদ্ধ প্রধান দেশের মধ্যে থাইল্যাণ্ডের কাজের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব বৌদ্ধদের কাছে আমাদের বক্তব্য পৌঁছিয়েছি। বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সদর দপ্তরের দীর্ঘ সাক্ষাৎকারই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসু হয়েছে। কেননা, আমাদের উদ্দেশ্যের মর্মকথা পৃথিবীর সব বৌদ্ধদের দরবারে পৌঁছেছে। অন্যান্য দেশে যা কিছু কর্ম তৎপরতা সংঘটিত হয়েছে-তা উক্ত দেশগুলোর নিজ নিজ দেশের সীমায়

সীমিত ছিল। কিন্তু থাইল্যাণ্ডের কর্ম তৎপরতা সমগ্র বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক ভূমিকা পালন করেছে।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশ্ববৌদ্ধ ভাতৃত্ব সংঘের সদর দপ্তর থেকে যে মাসিক পত্রিকা বের হয়েছে, সেই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় আমার ফটো সহ ব্যাংককে পৌঁছার উদ্দেশ্য উল্লেখিত এক মর্মন্তুদ বিবৃতি প্রকাশিত হয় এবং তা বিশ্বের রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিটি আঞ্চলিক শাখা কেন্দ্রে প্রচারিত হয়। প্রকাশিত ও প্রচারিত সেই ইংরেজী বিরতির বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ ঃ

বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের মাসিক পত্রিকা

সেপ্টেম্বর, অক্টোবর সংখ্যা, ২৫১৪ বুদ্ধাব্দ, ১৯৭১ইং

"বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভাতৃত্ব সংঘের সদর দপ্তরে মাননীয় জ্যোতিঃপাল সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে যে ভীষণ সন্ত্রাস ও মহা দুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনকল্পে পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রেসিডেন্ট মাননীয় জ্যোতিঃপাল ১৯৭১ সনের ১২ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার ব্যাংককে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর সঙ্গে এসেছেন, একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোক। তাঁর আগমনের পরদিন বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সদর দপ্তরে এসে সভানেত্রী ও সেক্রেটারী জেনারেল এর সাথে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। পূর্ব পাকিস্তানে বর্তমানে যে আতংক ও দুঃখ দুর্দশা ভোগের চরম অবস্থা বিরাজমান মাননীয় জ্যোতিঃপাল বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সভানেত্রী ও সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট তা বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ যে মহা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে তা বিশ্ব মানবের স্মরণযোগ্য কালের মধ্যে তা সর্বাধিক দুঃখপূর্ণ ঘটনার অন্যতম। বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধজনগণ দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন এবং তিনি নিজেও ত্রিশজন ভিক্ষু শ্রামন সহ ভারত সীমান্তে এসে পৌঁছেন। ব্যাংককে অবস্থানকালীন মাননীয় জ্যোতিঃপাল ব্যাংককের প্রসিদ্ধ বিহার মার্বেল টেম্পলে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সদ্ধর্ম প্রধান দেশের স্ব-ধর্মীয় লোকের নিকট পাকিস্তানী বৌদ্ধ শরণার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যের সন্ধানই তাঁর ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য। মাননীয় জ্যোতিঃ পাল ১৯৭১ সনের ১৬ই আগষ্ট জাপানের উদ্দেশ্যে ব্যাংকক ত্যাগ করেন এবং সেই মাসেই ২২ তারিখ নয়াদিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর এই ভ্রমণের খরচ বহন করেন তাঁর আচার্য ও সহগামী মুসলিম বন্ধু। মাননীয় জ্যোতিঃপাল বললেন যে, ভারতের আগরতলায় প্রাচ্য বিদ্যা বিহারে তিনি অবস্থান করবেন।"

বিশ্ববৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের প্রকাশিত এই মাসিক পত্রিকাটি থাইল্যাণ্ডে ও বিশ্বের সর্বত্র প্রেরিত ও প্রচারিত হওয়ায় বাংলাদেশের স্বপক্ষে আমাদের বিশ্ব জনমত সংগঠন এবং স্বীকৃতি লাভের সন্ধান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে। তাই বলি কলম্বো বা

টোকিওতে আমাদের যে কর্ম তৎপরতা সম্পাদিত হয়েছে-তা সেই সেই দেশের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ রয়েছে, কিন্তু ব্যাংককের ব্যাপক তৎপরতা বিশ্বের সকল দেশে প্রচারিত হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। তাতে বৌদ্ধ জগতে ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের সভানেত্রী রাজকুমারী পুনপিসমাই দিস্কুল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, থাইল্যান্ডে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদুত এবং বিশ্ব রাষ্ট্র সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উঃ থান্টের নিকট পত্রের আদান প্রদানের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করেন। পাকিস্তানী বৌদ্ধদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশ্বের কতিপয় বৌদ্ধ বিশিষ্ট রাষ্ট্র থেকেও পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। যার ফলে পাকিস্তান সরকার বৌদ্ধদের নিরাপত্তার জন্য পরিচয় পত্রের প্রচলন করেছিলেন। এই পরিচয় পত্রের মাধ্যমে স্বার্থান্বেষী লোকেরা বহু অর্থ উপার্জন করেছে। বহু অবৌদ্ধকে বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিতে গিয়ে অর্থাগমের পথ সুগম করেছে মাত্র। চিন্তাশীল লোক মাত্রই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে একটা আন্তর্জাতিক আন্দোলন ব্যতিরেকে পাকিস্তান সরকার চার সম্প্রদায়ের অধ্যুষিত রাষ্ট্রে শুধু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য কি দয়ায় পড়েই তৎপর হয়েছিলেন-না দায়ে পড়ে করেছিলেন। এই নিরাপত্তা বিধানের উৎস কোথায়?

নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

১৯৭১ সনের সেপ্টেম্বর মাসের ১৮,১৯ ও ২০ তারিখ নয়াদিল্লীতে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমি বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধি হিসাবে আমন্ত্রন পেয়ে অংশগ্রহণ করেছি। এবং বিভিন্ন আলোচনায় যোগ দিয়েছি। এই সম্মেলনে বিশ্বের ৩১টি রাজ্যের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও পরবর্তীকালে নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশের হাই কমিশনার ডক্টর এ, আর, মল্লিক। বাংলার বিখ্যাত মনীষী সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য। প্রতিদিন এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছিলেন ভারতের সর্বোদয় নেতা শ্রীজয় প্রকাশ নারায়ণ। তিনিই এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা। সম্মেলনের প্রথম দিন সর্ব প্রথম বক্তা ছিলেন ডক্টর মল্লিক। অধিকৃত বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্বের প্রতিনিধি বর্গের সম্মুখে বিরাট জনাকীর্ণ সমাবেশে ডঃ মল্লিক দীর্ঘ এক ঘন্টা যাবৎ যে মর্মস্পর্শী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করলেন, তাতে বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ চিত্র সভাগৃহে দর্পণের ন্যায় তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর বক্তৃতার পর সভাগৃহ স্তম্ভিত ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনিতে সোচ্চার হয়ে উঠে।

১৯শে সেপ্টেম্বর, রবিবার সভার পরে এক ঘরোয়া বৈঠকে The World Conference of Religion for peace এর সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ হোমার জ্যাকের সাথে আমি মিলিত হয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনায় ব্যাপৃত হই। এসব আলোচনার ভিত্তিতে তিনি অধিকৃত বাংলাদেশের বৌদ্ধদের মর্মান্তিক অবস্থা সম্পর্কে দৃঢ় মত প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ সংক্রান্ত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিভিন্ন বৌদ্ধ রাষ্ট্র থেকে যে সকল প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন, আমি তাঁদের সবাইকে আমন্ত্রণ করে দিল্লী জগজ্যোতিঃ বিহারে নিয়ে যাই এবং বৌদ্ধ ও অন্যের উপর পাক হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করি। এই বৈঠকে নেতৃত্ব করেছেন সিংহলের যোগাযোগ মন্ত্রী ও Ceyleon Committee for human rights in East Bangal এর চেয়ারম্যান মিঃ সেনাপথ গুণ বর্দ্ধন ও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও Bangladesh liberation Committee এর চেয়ারম্যান ডঃ টি, নারা। জগজ্যোতি বিহারের অধ্যক্ষ আয়ুস্মান শ্রীধর্ম বিরিয়ো অভ্যাগত প্রতিনিধিগণকে মিষ্টি, নানা প্রকার সুস্বাদু ফল ও চা-চক্রে আপ্যায়িত করেন।

আন্তর্জাতিক এই মহা সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার পর আয়ুষ্মান শ্রীধর্ম বিরিয়োর সৌজন্যে ও সহযোগীতায় আমি ভারতীয় সাহায্য পুণর্বাসন মন্ত্রী মাননীয় আর, কে খাদিল করের সাথে কয়েকবার সাক্ষাৎ করি। এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য হলো আগরতলায় যে সব শরণার্থী ভিক্ষু শ্রামণ আছেন, সোজা সরল কথায় বলতে গেলে তাঁরা আহারে বিহারে রীতিমত কষ্টে আছেন। মিঃ খাদিলকর সাহেবের অনুগ্রহ লাভে তাঁদের কষ্টের কিছু লাঘব করা সম্ভব এই উদ্দেশ্যে আয়ুষ্মান ধর্ম বিরিয়োর চেষ্টা যত্নে মিঃ খাদিলকর আগরতলায় শরণার্থী ভিক্ষু শ্রামণগণের জন্য এগার হাজার সাতশত টাকা মঞ্জুর করে পাঠান। এই মঞ্জুরীকৃত টাকা আমাকে দেওয়া হবে আগরতলা সাহায্য পুণর্বাসন তহবিল থেকে। তাই আমার আগরতলা পৌঁছানো প্রয়োজন। অতঃপর আমি আগরতলা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বাংলাদেশ মিশন আমাকে কলকাতা হয়ে আগরতলা পৌঁছানোর জন্য বিমানের টিকেট ক্রয় করে দিলেন। টিকেট পাওয়ার পর হঠাৎ মাথায় আরেক বুদ্ধি চাপল। সহসা কি আবার দিল্লী আসতে পারব? দিল্লীর আশে পাশে যত তীর্থস্থান, যত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান, নয়নাভিরাম দর্শনীয় বস্তু আছে, একেবারে কিছু না দেখে সরাসরি আকাশমর্গে উড়ে চলে যাওয়া কিছুতেই উচিৎ হবে না। অন্ততঃ কিছু দেখে যাওয়া দরকার। এই সিদ্ধান্তে বিমানের টিকেট বাতিল করে ৪৫০ টাকা পেলাম। তাতে আগ্রার তাজমহল, হুমায়ুন কেল্লা, ময়ূর সিংহাসন, জামে মসজিদ, দিওয়ান-ই-খাম প্রভৃতি মোগল যুগের পুরাকীর্তি ও মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করলাম। আরো উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত কুব্বাতুল ইসলাম মসজিদ-ইসলামী স্থাপত্য বিদ্যার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এবং সারা

মুসলিম জাহানের গৌরবের বস্তু। এটার প্রতিষ্ঠাতা আইবক ছিলেন প্রথম সুলতান। পরবর্তীকালে ইন কুবুমিন ও আলাউদ্দিন এই মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। ২৩৪ ফুট উচ্চ কুতুব মিনার ইসলামের আধিপত্য ও প্রভাবের বার্তা আজও বহন করছে। আজমীরের আড়াই দিনকা ঝোপড়া কুতুবুদ্দিন ও ইল তুত মিসের শিল্পপ্রীতি অন্যতম বিখ্যাত নিদর্শন। খলজী যুগে মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম বিখ্যাত নিদর্শন হলো আলাউদ্দিনের নির্মিত আলাই দরুয়াজা, হুমায়ুন মসজিদ প্রভৃতি। গান্ধী পার্ক, গান্ধী ও নেহেরুর শ্মশান, নেহেরু যাদুঘর, বিরলা মন্দির, লাদাক বৌদ্ধ বিহার, লাল কেল্লা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান দিল্লীতে অবস্থানকালে এসব কীর্তি ফাঁকে ফাঁকে দর্শন করেছি। বৌদ্ধ জগতে শ্রী সত্য নারায়ণ গোয়েঙ্কা একজন বৌদ্ধ ধর্মে সিদ্ধাচার্য, বিদর্শন ভাবনাগুরু। তাঁর পূর্ব পুরুষের বাসভুমি হচ্ছে বোম্বে। তাঁর পিতা ব্যবসায় বাণিজ্য উপলক্ষে বার্মায় গিয়ে বহুকাল অতিবাহিত করেছিলেন। গোয়েঙ্কাজীর জন্মস্থান বার্মাদেশে। তিনি ছোট বেলা থেকে শিরপীড়ায় ভুগতেছিলেন। তাঁর অর্থাভাব মোটেই ছিলনা। তিনি শিরপীড়া আরোগ্যকল্পে পৃথিবীর কোন দেশের কোন ডাক্তার বাকী রাখেননি। কিন্তু শিরপীড়া কিছুতেই নিরসিত হলনা। অবশেষে বার্মাদেশে ফিরে এসে তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধুর পরামর্শে বৌদ্ধ সাধনার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বিদর্শন ভাবনায় নিরত হলেন। এই বিদর্শন সাধনার প্রভাবে তিনি পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করলেন। সাথে সাথে আজীবন দুর্ভোগ্য শিরপীড়াও চিরতরে উপশমিত হয়ে গেল। তিনি নবজীবন লাভ করলেন। বর্তমানে তিনি বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ইগতপুর নামক এক পাহাড়ে এক বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই কেন্দ্রে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের লোক সমবেত হন এবং বিদর্শন অনুশীলন করে আত্ম বিশুদ্ধি ও জীবন মুক্তি লাভ করেন। প্রতিদিন বিশ্বের তিন শতাধিক লোক তাঁর কেন্দ্রে অনুশীলন রত থাকেন।

দিল্লী অবস্থানকালে আমি তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য লাভ করে পরম সৌভাগ্যশালী হতে সক্ষম হয়েছিলাম। একদিন সন্তনগরে জগজ্যোতি বিহার প্রাঙ্গণে দ্বিতীয় দিন দিল্লী রেল ষ্টেশনের বিশ্রামাগারে। উভয় দিনই তিনি বিদর্শন ভাবনা সম্পর্কে অমৃতবারি বর্ষণ করলেন। তাঁর সুমধুর ভাষণ শ্রবণে জীবন ধন্য করলাম।

অতঃপর দিল্লী ত্যাগ করে গয়া কাশীর উদ্দেশ্যে রওনা হব, এমন সময় ফরুক্কাবাদ জিলার নিবকরোরি থেকে এক নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। পত্র লেখক হচ্ছেন-শ্রী শিমুল কান্তি বড়ুয়া। তিনি সেখানকার বৈদ্যুতিক ফার্মে বহুদিন ধরে কাজ করে আসছেন। নিবকরোরি হচ্ছে দিল্লী ও গয়ার ঠিক মাঝামাঝি পথে অবস্থিত। আরো আনন্দের কথা হলো নিবকরোরির পাশেই বৌদ্ধযুগের শাঙ্কস্য নগর, সেখানে এখনো বৌদ্ধ স্তুপ, মন্দির ইত্যাদি দর্শনীয় বস্তু ও তথাগতের অনন্ত গুণাবলী স্মরণ পুজা করার অনেক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রয়েছে।

২২শে সেপ্টেম্বর বুধবার রাত্রি ১০ টায় শ্রীধর্ম বিরিয়ো ও আমি নিবকরোরি হয়ে গয়ার উদ্দেশ্যে দিল্লী ত্যাগ করলাম। নিবকরোরি পৌঁছলাম পরদিন বেলা দশটায়।

আমাদিগকে পেয়ে শিমুল বাবু ও তাঁর ছেলে মেয়েদের আনন্দ আর ধরে না। তাঁর বাসায় মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ১ টার সময় আমরা রওনা হলেম শাঙ্কস্য নগরে। বেলা ২ টার সময় সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। এবং তথাকার সবকিছু দর্শন করে সন্ধ্যা ৭টার সময় আবার আমরা শিমুল বাবুর বাসায় ফিরে আসি। পরদিন বারটার মধ্যে শিমুল বাবু তাঁর উদ্দেশ্যকৃত সব কাজ সমাধা করলেন।

২৪শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার আমরা ১ টার সময় গয়ার উদ্দেশ্যে নিবকরোরি ত্যাগ করি। দিনের বাকী অংশ ও সারা রাত্রি একটানা ট্রেন ভ্রমণ করে পরদিন সকাল ৮টায় বুদ্ধ গয়া এসে পৌঁছলাম। বুদ্ধ গয়ার থাই বৌদ্ধ বিহারে গত কয়েকবৎসর ধরে পরম পুজনীয় আনন্দমিত্র মহাস্থবির অবস্থান করে আসছেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে থাই বৌদ্ধ বিহারেই আশ্রয় গ্রহণ করি। বুদ্ধ গয়ায় আমার আগমন এই চতুর্থবার। বুদ্ধ গয়া ও পার্শ্ববর্তী সব দর্শনীয় স্থান ইতোপূর্বে তিন তিনবার আমার দর্শন করা হয়েছে। এখান নুতন করে দর্শনের কিছু নেই। তথাপি গয়ার বুদ্ধ মন্দিরে, মহা বোধিমুলে তথাগতের সাধনপীঠে, বুদ্ধত্ব লাভের পর প্রথম ৪৯ দিনের অবস্থানে গিয়ে ধুপ ধুনা প্রদীপাদি প্রজ্জালিত করে তথাগতের অনন্ত গুণাবলী স্মরণ পুজা করলাম।

বুদ্ধ গয়ায় ২ দিন অবস্থানের পর পরম পূজ্য আনন্দ মিত্র মহাস্থবির সহ আমরা চলে গেলাম রাজগৃহে। রাজগৃহ বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখযোগ্য প্রাচীন কীর্তির শ্রেষ্ঠতম তীর্থস্থান, পীঠস্থান ও শিক্ষাকেন্দ্র। প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমান নব নালন্দা বিহার, বিশ্বশান্তি স্তুপ, জাপানী ধর্মশালা, থাই বুদ্ধ মন্দির, চৈনিক ধর্মশালা ইত্যাদি প্রাচীন ও আধুনিক যুগের আরো বহু দর্শনীয় নিদর্শন রয়েছে। আমি প্রায় সবগুলোই দর্শন করলাম।

২৭শে সেপ্টেম্বর সোমবার বিশ্বশান্তি স্তুপ দর্শন করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম-এই স্তুপ অপূর্ব। প্রাচীন বৌদ্ধ যুগের চারু শিল্প কারু শিল্প এবং বর্তমান যুগের অভিনব আধুনিকতার অপূর্ব সমন্বয় রাজগৃহের এই বিশ্বশান্তি স্তুপ। এটা রাজগৃহের সর্ব্বোচ্চ পর্বত শীর্ষে অবস্থিত। এই স্তুপ দর্শনের জন্য পর্বত শীর্ষে উঠার যে বিদ্যুৎ চালিত পদ্ধতি, তাও ভারতবর্ষে একান্ত অভিনব ও অদ্বিতীয়। মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর দেখেছি-বিদ্যুৎ চালিত সিঁড়ি (Escalation) । পিনাঙ্গে দেখেছি পবর্ত শীর্ষে আরোহণ করার বিদ্যুৎ চালিত রেলগাড়ী আর রাজগৃহে দেখলাম বৈদ্যুতিক তারে ঝুলানো যাত্রীবাহী চেয়ার। পূজ্য মহাস্থিবির ও আমি পর্বত পাদদেশে পাশাপাশি দু'টো চেয়ারে বসে পড়লাম। চেয়ারগুলো তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুক্ষিতে ধারণ করে আমাদিগকে পর্বত শীর্ষে বিশ্বশান্তি স্তুপের প্রাঙ্গণে নিয়ে পৌঁছায়ে দিল। বিশ্বশান্তি স্তুপের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া মাত্রাই চক্ষুস্থির হয়ে গেল। এই নমুনার বৌদ্ধ স্তুপ সিংহল বার্মা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রধান দেশে এরূপ রাশি রাশি স্তুপ দেখতে পাওয়া যায়। প্রাচীন

ভারতের বৌদ্ধ যুগের এরূপ স্তুপের অভাব ছিল না। কিন্তু আজ ভারত বাংলায় এই পদ্ধতির কোন স্তুপ দৃষ্টি গোচর হয় না। আমি বিশ্বশান্তি স্তুপটি তিনবার প্রদর্শন করে তথাগত বুদ্ধের অনন্ত গুণাবলীর কথা স্মরণ পূর্বক ভক্তি প্রণতঃ শিরে অভিবাদন করে ও অধিকৃত বাংলাদেশের আশুমুক্তি ও সাম্য শান্তির কল্পনায় প্রার্থনা জানাই। স্তুপ দর্শন করে আমরা বিদ্যুৎ চালিত চেয়ারে আর অবতরণ করলাম না। কৌতুহল বলে অবতরণ করলাম-পর্বত গাত্রে নব নির্মিত স্থাপত্য সিঁড়ি বেয়ে। অবতরণকালে সিঁড়ির পাশে গৃহ্যকুট পর্বত দৃষ্টি গোচরে এলো যেখানে একদা তথাগত বুদ্ধ অবস্থান করেছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গয়ার থাই বিহারের অধ্যক্ষ রাজ-গৃহ থেকে ফেরার পথে আমরা তাঁর সাথে সেই দিনই বুদ্ধ গয়ায় প্রত্যাবর্তন করি।

২৯শে সেপ্টেম্বর বুধবার বুদ্ধ গয়া ত্যাগ করে আমরা কলকাতা ধর্মাংকুর বিহারে এসে পৌঁছেছি। ধর্মাংকুর বিহারে আমার আচার্য্যদেব পুজনীয় ধর্মাধার মহাস্থবির ও আয়ুস্মান প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ স্থবির, জ্ঞানানন্দ স্থবির, ধর্মপাল স্থবির প্রভৃতি বহু ভিক্ষু শ্রামণ বাস করেন। তাছাড়া কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে আমার বহু শিষ্য সেবক আছে। আমি আচার্যদেবের পদমুলে বাস করেই শিষ্য সেবক ও শুভানুধ্যায়ী গণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করতে আরম্ভ করি। আচার্যদেব ও শিষ্য সেবকগণ আগরতলায় শরণার্থী ভিক্ষু শ্রামণগণের জন্য ব্যয় বহুল অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। তাঁদের সাহায্যে সহানুভূতিতে শরণার্থী ভিক্ষু শ্রামনগণের জীবন জীবিকার অত্যধিক উপকার সাধিত হয়। বিশেষ করে আমার প্রতি তাঁরা মুক্ত হস্তে সাহায্য করেছেন। তাঁদের হৃদ্যতাপূর্ণ সহানুভূতি আমাকে অনেকাংশে ঋণী করে ফেলেছে।

ইতোমধ্যে মুজিবনগরস্থ বাংলাদেশ মিশনের কর্মীদের সাথে কয়েকবার মিলিত হয়েছি। বিশেষ করে প্রথম ও প্রধান সেক্রেটারী জনাব আবদুল করিম চৌধুরীর সাথে আমাদের বিদেশে কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে বিশেষরূপে আলোচনা হয়।

তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, বিদেশে ভ্রমণের ফলাফল সম্পর্কিত একটা লিখিত রিপোর্ট দাখিল করব কিনা। তিনি বললেন-"জনাব ফকির শাহাবুদ্দিন সাহেব যখন পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিয়েছেন, তখন আপনাকে পৃথকভাবে আর রিপোর্ট দিতে হবে না"।

তখন আগরতলা কলকাতা যাতায়াতে যাত্রীদের খুব ভীড়। টিকেটের চাহিদা খুব বেশী। আমি টিকেট কিনতে গিয়ে দেখি, ২৫ দিন পর ছাড়া আমার আগরতলা যাওয়া সম্ভব হয় না। আমি গত্যন্তর না দেখে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র সেক্রেটারী জনাব মাহাবুল আলম চাষী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি দয়া করে একদিন পরেই বাংলাদেশ মিশনের কর্মী হিসাবে রিজার্ভ সিটে আমাকে আগরতলা পৌঁছার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আবার আগরতলায়

৮ই অক্টোবর শুক্রবার আমি আগরতলার উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করি। বিমান আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করে দৈত্যগতিতে উড়ে এসে গৌহাটিতে অবতরণ করল। তারপর বিমানের ইঞ্জিনে গোলযোগ লেগে যাওয়ায় সেদিন আর আগরতলা পৌঁছা গেলনা। এক রাত্রি গৌহাটি থাকতে হয়েছে। পরদিন সকাল ১১ টায় আগরতলায় পৌঁছলাম।

আগরতলা বেণুবন বিহারে যে সব শরণার্থী ভিক্ষু শ্রামণ ছিলেন, তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের সুখ-দুঃখের খবর নিলাম। বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তা জনাব জহুর আহম্মদ চৌধুরী, জনাব আকবর আলী খান ও ডঃ হোসেন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে বিদেশে আমাদের কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করি।

ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শরণার্থী শিবির থেকে সমস্ত বৌদ্ধ শরণার্থীগণকে যে তোতা বাড়ী শিবিরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল-তাদের খবর নিতে গিয়ে বড়ই মর্মাহত হলাম। শরণার্থী পরিবারের মধ্যে খুব কম পরিবারই আছে যে পরিবার মাতা বা পিতাকে, ভাই বা বোনকে, ছেলে বা মেয়েকে না হারিয়েছে। কোন কোন পরিবার একেবারে উচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আরো মর্মঘাতী খবর পেলাম বাংলাদেশ থেকে। বাংলাদেশস্থ বরইগাঁও গ্রামে আমার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহ লুণ্ঠিত, আসবাব পত্র অপহৃত, লাইব্রেরীর শতশত বইপুস্তক অগ্নিসংযোগে ভস্মীভুত।

আগরতলা কয়েকদিন অবস্থানের পর আমার শিষ্য সেবক নিয়ে আমি চলে গেলাম নব প্রতিষ্ঠিত "আগরতলা বৌদ্ধ মিশনে" যা বিদেশ গমনের পূর্বে জায়গা খরিদ করে একটি বুদ্ধ মন্ডপ ও ভিক্ষুদের জন্য একটি বাসগৃহ নির্মাণ করে একজন বুড়ো শিষ্যকে রেখে গিয়েছিলাম সেই আমতলী সূর্যমনি নগরে। এই নব নির্মিত আশ্রমের নামকরণ হয়েছে- "আগরতলা বৌদ্ধ মিশন"। এটার সংস্থিত স্থানটি আগরতলা থেকে তিন মাইল ব্যবধানে দক্ষিণগামী রোডের পূর্বধারে অতি সন্নিকটে অবস্থিত। এর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। এখান থেকে আগরতলা যাতায়তের উত্তম ব্যবস্থা। প্রতি ২/৪ মিনিট পরপর বাস সার্ভিস দক্ষিণ ত্রিপুরার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। আমতলী বাজার পর্যন্ত টাউন সার্ভিস বাস। হাইস্কুল, জুনিয়র হাই স্কুল, পোষ্ট অফিস, হাটবাজার, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করেই এই স্থান পছন্দ করেছি ভবিষ্যতে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষায়।

এখানে আমি শিষ্য সেবক নিয়ে দিনগুলো অতিবাহিত করছি। উত্তর পার্শ্বের টিলায় ছয় হাজার শরণার্থী অধ্যুষিত বিরাট শিবির। দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে স্থায়ী বাসিন্দা লোকজনের বাস। দিনরাত আমার আশ্রমে ভক্ত সমাগম। মাঝে মাঝে ভক্তবৃন্দের মনো

বিনোদনকল্পে শাস্ত্র পাঠ, ধর্মালোচনা হত। ভক্ত বৃন্দের মধ্যে শ্রী পরেশ নাথ আচার্য্য ও তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতি শান্তি বালা আচার্য্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা শুধু ধর্ম ভক্তির পরিচয়ই দেননি, আমার প্রাত্যাহিক জীবন-জীবিকা নির্বাহের তত্ত্বাবধানও করতেন। তাঁদের ত্যাগ, স্নেহ মমত্ব ও শ্রদ্ধা ভক্তির কথা আমি জীবনেও ভুলতে পারব না। ভুললে আমার জীবনই মিথ্যা হয়ে যাবে। এরূপে অল্প কিছুদিনের মধ্যে আশ্রমের প্রতি স্থানীয় জন সাধারণ ও সরকারের শুভ দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল-তাতে মনে হয়েছিল যে, আশ্রমের ভবিষ্যৎ অতিশয় সমুজ্জ্বল।

বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে আমার হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ বহু সংখ্যক ছাত্র মুক্তিযোদ্ধারূপে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের কেউ সুস্থ দেহে, কেউবা জীবন্তে মৃত প্রায় হয়ে ফিরে এসেছেন। আর কেউ বা ফিরে আসেন নি। মাতৃভুমির উদ্ধারকল্পে চিরতরে অনন্তে বিলীন হয়ে গেছেন। তাঁরা সবাই যুদ্ধে নামবার প্রাক্কালে দোয়া দাক্ষিণ্যের সন্ধানে আমার নিকট উপস্থিত হতেন। আমি তাঁদেরকে বাংলাদেশের আদর্শ, স্বাধীনতার মাহাত্ম্য, দেশাত্ববোধ এবং পরাধীন জীবনের দুর্বিসহ দুঃখ অশান্তি সম্পর্কে নানাভাবে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত করেছি। এতে তাঁরা খুব আনন্দ ও গৌরববোধ করতেন।

নভেম্বর প্রায় শেষ। বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে প্রায়দিনই গোলাগুলির শব্দ শোনা যায় তাতে মানুষের অন্তর সন্ত্রস্ত। এদিকে দেখা যায় আগরতলা থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরায় যোগাযোগ রক্ষাকারী রাজপথটি অহরহঃ ব্যস্ত। সামরিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পিপঁড়ার মত অসংখ্য যান বাহনের ক্ষণে ক্ষনে আনাগোনা। এক মিনিটের জন্য ফাঁক নেই, বিশ্রাম নেই। যানবাহনের অবিরাম যাতায়তের দাপটে মুহুমুর্হু কর্ণ বিদারী বিকট শব্দে অতিষ্ট হয়ে যেতাম। এতে অনুমান করা অযৌক্তিক হয়নি যে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সৈন্যের সম্মিলিত বাহিনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারেন। এরূপে কয়েকদিন চললো আকাশ বাণীর মারফত হঠাৎ শুনতে পেলাম ডিসেম্বর মাসের ১ লা তারিখ বৌদ্ধ রাষ্ট্র ভুটান সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করল। তৎপূর্বে ব্যাংকক থাকাকালীন ভুটান ব্যাংককে আমাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন। ডিসেম্বর মাসের তিন তারিখ পাকিস্তান ভারত আক্রমন করেছে। অমনি ৫ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রি ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করলেন। তারপর থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনী উভয়ের যৌথ উদ্যোগে ও সহযোগিতায় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। মাত্র দশ দিনের যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনী পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনী পরাজয়ের মর্মন্তুদ চরম পর্যায়ে পড়ে ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে। তস্ত্ববনে বাঙালী জাতি ও ভারতবাসী আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে।

চতুর্থ অধ্যায়

মুক্ত স্বদেশভূমির ডাক

অতঃপর স্বাধীন বাংলায় ফিরে যাওয়ার এক হিড়িক পড়ে গেল। জীবনের দায়ে সে সংকীর্ণ শিবিরের কোন ঠাঁসা কোঠায় আশ্রয় নিয়েছে। আজ স্বাধীনতার স্বাচ্ছন্দ্যবোধে আর কে থাকে এখানে? তাই যে যেভাবে পারছে শরণার্থী শিবির থেকে কর্তৃপক্ষের অনুমতির অপেক্ষা না করেই দেশের দিকে ছুটছে। দেখতে দেখতে সীমান্তের শিবিরগুলো প্রায় খালি হয়ে গেল। আমি তখনও আমার নব প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে বসে বসে দিন গুনছি। ভাবছি এখন আমার কর্তব্য কি? এত টাকা পয়সা ব্যয় ও এত পরিশ্রম স্বীকার করে আশ্রয় করলাম। এটা ত্যাগ করে কি করে চলে যাই? এই পরিকল্পনায় কত জনের কত সাহায্য সহানুভূতি গ্রহণ করলাম। ঐদিকে বাংলাদেশের বরইগাঁও গ্রাম আমার স্বদেশ ভূমির পৈতৃক বাসস্থান এবং সেখানেও বহু সমাজ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত। আমার সারা জীবনের সংগঠন ও সাধনার পীঠস্থান। কি করে বরইগাঁও গ্রামকে উপেক্ষা করি? এরূপ চিন্তায় আমি বিভোর। এমন সময় কলকাতা থেকে বহু পত্র ও বাংলাদেশ থেকে অনেক টেলিগ্রাফ আসতে লাগল। আমি যেন কাল বিলম্ব না করে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হই। শুধু চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম দিয়েই নিরস্ত রইলেন না। বাংলাদেশ থেকে দুইজন ভিক্ষু আগরতলা এসে হাজির। তাঁরা হলেন-পূজনীয় শ্রী সুমঙ্গল মহাস্থবির ও আয়ুষ্মান শ্রী আর্য্যবংশ ভিক্ষু। মহাস্থবির মহোদয় তোড়-জোর শুরু করলেন এবং বললেন "আর বিলম্ব করা চলবে না। কালই তোমাকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হতে হবে"।

আমার আগেই বহু ভিক্ষু শ্রামণ শিবির ত্যাগ করে বাংলাদেশে চলে গেছেন। আমিও বহু দায়িত্বের সম্মুখে চোখ বোজে বাংলাদেশে আসার সংকল্প গ্রহণ করি। এদিকে ভারতীয় সাহায্যে পুর্নবাসন মন্ত্রী মাননীয় আর, কে, খাদিলকর যে শরণার্থী ভিক্ষু শ্রামণদের জন্য এগার হাজার সাত শত টাকা দিল্লী থেকে মঞ্জুর করে পাঠিয়ে ছিলেন, ত্রিপুরার সাহায্য পুণর্বাসন ডাইরেক্টর মিঃ উমেশ সায়গণ মাত্র দুই হাজার সাতশত টাকা আমাকে দিলেন। আর বাকী নয় হাজার টাকা, আমি যদি বাংলাদেশে না এসে ভারতে থেকে যাই, তবে পরে আশ্রমের উন্নয়নকল্পে দিয়ে দিবেন, নচেৎ দিবেন না বলে জানালেন। আমি অবশিষ্ট নয় হাজার টাকার আশা ও ভারতে অবস্থানের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে ১৯৭২ সনের জানুয়ারী মাসের ৭ তারিখ শুক্রবার একটি গাড়ী ভাড়া করে ১৫ জন ভিক্ষু শ্রামণ ও আমার শিষ্যসেবক নিয়ে দেশে ফিরে আসি। দীর্ঘ ৫৫ মাইল অতিক্রম করে

আমাদের গাড়ী যখন আলীশ্বর বিহারে এসে পৌঁছে তখন সন্ধ্যা অত্যাসন্ন। গাড়ী থেকে নেমে ভাবলাম দুষ্কৃতিকারীর দৌরাত্মে বরইগাঁও বিহার উচ্ছিন্ন, বসবাসের অনুপযোগী। রাত্রে সেখানে গিয়ে কি করব? তাই সেই রাত্রি আলীশ্বর বিহারেই যাপন করি। পরদিন সকালে এসে দেখি-বরইগাঁও বিহারে মেলা মহোৎসবের ন্যায় লোক সমাগম। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ সকলেই আমার আগমন প্রতীক্ষায় আছেন। আমি বিহারে পৌঁছে মৃত ব্যক্তির শ্মশান যাত্রার প্রাক্কালে মরা বাড়ীর যে দৃশ্য, জীয়ন্তেই সেই দৃশ্য আমার বিহারে প্রত্যক্ষ করলাম। আমি নিজেও ধৈর্য্যচ্যুত হয়ে ভেঙ্গে পড়লাম। দু'নয়নের উষ্ণ অশ্রু সংবরণ আমার সাধ্যের অতীত হয়ে গিয়েছিল।

অতঃপর আমি আমার আজীবন গড়া প্রতিষ্ঠান সমূহ একে একে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। প্রথমতঃ মন্দিরে ঢুকে দেখি খালি মন্দির। দেব দেবীর কোন নিদর্শন নেই। অনেক প্রকার মূল্যবান পুজোপকরণে সজ্জিত ছিল এই বেদী। কিন্তু আজ সর্বশূন্য দারিদ্র্যে ও সকরুণ দৃশ্যে পর্যবসিত। বালিকা বিদ্যালয়ের ঘর দরজা কিছু নেই। শুধু খালি ভিটা উন্মুক্ত আকাশ তলে লুট তরাজের সাক্ষী স্বরূপ বিরাজ করছে। সমাজ কল্যাণ সংস্থার বয়ন তাঁত, সূতার মিস্ত্রী কাজের যন্ত্রপাতি, টাইপ রাইটার মেশিন ও সীবন শিক্ষার সকল দ্রব্য সম্ভার, আসবাবপত্র লুণ্ঠিত ও অপহৃত। অনাথ আশ্রমের অনাথ বালকদের ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী, বই পুস্তক, তৈজষ পত্র ইত্যাদি সবকিছু নষ্টীকৃত ও অপহৃত। বাসগৃহ সমূহের শুধু দেওয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। তাও নিখুঁত নহে। দরজা জানালা পর্যন্ত উধাও হয়ে গেছে। লাইব্রেরীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই অন্তরে বিষাক্ত শেল বিদ্ধ হয়ে গেল। পাঁচটি বড় বড় আলমারী ভর্তি বই পুস্তক ছিল কয়েক হাজার। দেশ বিদেশ থেকে বহু দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্যের অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করেছিলাম। আজ বহু বৎসর যাবৎ এই অঞ্চলের সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার শিক্ষাকামীগণের অশেষ কল্যাণ সাধন করে আসছে এই লাইব্রেরী। দেশ বিদেশ থেকে বহু গণ্যমান্য মনীষী এখানে এসে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষা করেছেন। এখান থেকে এযাবত কয়েকটি গ্রন্থ বের হয়েছে, দুইটি এখন যন্ত্রস্থ, কয়েকটি পান্ডুলিপি প্রস্তুত। এই লাইব্রেরী কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের গন্ডীবদ্ধ নহে। সকল ধর্মের ধর্মগ্রন্থ ও সাধারণ শিক্ষার বই পুস্তকে পরিপূর্ণ ছিল। সারা জীবন বিন্দু বিন্দু করে অমুল্য সম্পদের যে বিরল সংগ্রহ আমি করেছি আমার বাকী জীবনে আর কি তা সম্ভব? এখন দেদার টাকা পয়সা হাতে হলে প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য সম্ভার ও আসবাবপত্রের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করা সম্ভব, কিন্তু লাইব্রেরীর ক্ষতি অপরিপূরণীয়। লাইব্রেরীর বই পুস্তক ভস্মে পরিণত না করে আমার জীবন বিদগ্ধ করা ভাল ছিল। আমার জীবনে না লাগলেও লাইব্রেরী ভবিষ্যতে জনসাধারণের কাজে লাগত। আমার জীবনে এটা সর্বাধিক মর্মঘাতী ও অবিস্মরণীয় ঘটনা। কীটের নিকট বই পুস্তকের মুল্য যতখানি, মুর্খ লোকের নিকট গ্রন্থাদির মূল্য ততখানিই। ততোধিক কিছু যদি হয়, তবে অমূল্য গ্রন্থের কাগজে ঠোংগা বানানো পর্যন্তই মুর্খের মুল্যবোধ।

ঘোর অমানিশার মহান্ধকারে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠল, আলোক সম্পাত করল। সারা জীবন ব্যাপী কঠোর পরিশ্রমে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের ধ্বংসাবশেষ দর্শনে যে শোচনীয় ও বক্ষ বিদারী দুঃখ গ্লানিতে বিদগ্ধ হচ্ছিলাম, তাতে শীতল বারি সিঞ্চিত হলো, বিপুল আনন্দের সঞ্চার হলো এইভাবে যে, আমরা স্বাধীন হয়েছি। আরো শুনতে পেলাম যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের লৌহ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে আসছেন।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন মানসে

শেখ মুজিবুর রহমান ১০ই জানুয়ারী সোমবার বেলা ৪টার সময় ঢাকা এসে পৌঁছবেন। আমি ১০ তারিখ ভোর ৬ টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে বরইগাঁও ত্যাগ করি। আমার সঙ্গে আছেন রাঙ্গামাটির ভিক্ষু অমৃতানন্দ। চাঁদপুর থেকে ঢাকাগামী লঞ্চ ৮/৯ মাইল চলার পর হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেল। লঞ্চের ইঞ্জিনে কি একটা গোলযোগ লেগে যাওয়ায় লঞ্চ আর অগ্রসর হলো না। জানতে পারলাম লঞ্চ আর চলবে না।লঞ্চের ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এখান থেকে দশানী মোহনপুর অবতরণ করলাম। মোহনপুর হাই স্কুলে আমার ছোট ভাই শ্রী ধীর সেন সিংহ বি এস সি শিক্ষকতার কাজ করে। স্কুলের হেড মাস্টার শ্রী নারায়ণ দাস আমার পরিচিত আত্মীয়। আমি যখন হেড মাষ্টারের বাসায় গিয়ে পৌঁছি- তখন বেলা একটা। ঘন্টা খানেক পরেই হেড মাষ্টার মহাশয়ের ট্রানজিষ্টারটি উদ্বোধন করে সামনে অনুক্ষণ ধরে রাখলাম। মোহনপুর বসেই বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুর আগমনী খবর, বিমান থেকে অবতরণ,ট্রাকে করে পল্টন ময়দানে শোভা যাত্রা সহকারে আগমণ, জনসভার কর্মসূচী ও বঙ্গবন্ধুর ওজস্বিনী ভাষায় অশ্রুমুখী অভিভাষণ সব শুনলাম। তাঁর আবেগপূর্ণ ভাষণ শ্রবনে আমি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়লাম।

সকরুণ কণ্ঠে তিনি কবিগুরুর কবিতা আবৃত্তি করলেন–

নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম, জননী বঙ্গভূমি,
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি

উপসংহারে বললেন– আজ আর বক্তৃতা নয়। বল নেই, কয়েকদিন খাওয়া দাওয়া করে বক্তৃতা পরে দিব। তখন আমি সংবেগ সংবরণ করতে পারি নি। চোখের দুই কোঠায় সজোরে অশ্রু ভেসে উঠল। কতক্ষণ পরে কিছুটা সান্তনা বোধ করলাম।

সেই রাত্রি মোহনপুরে যাপন করে পরদিন আমি ঢাকা চলে যাই। ১২ই জানুয়ারী সকাল ৮টার সময় ধানমন্ডির ১৮নং রোডস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হলাম। আমার সঙ্গে ছিলেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সাধারণ সম্পাদক মিঃ
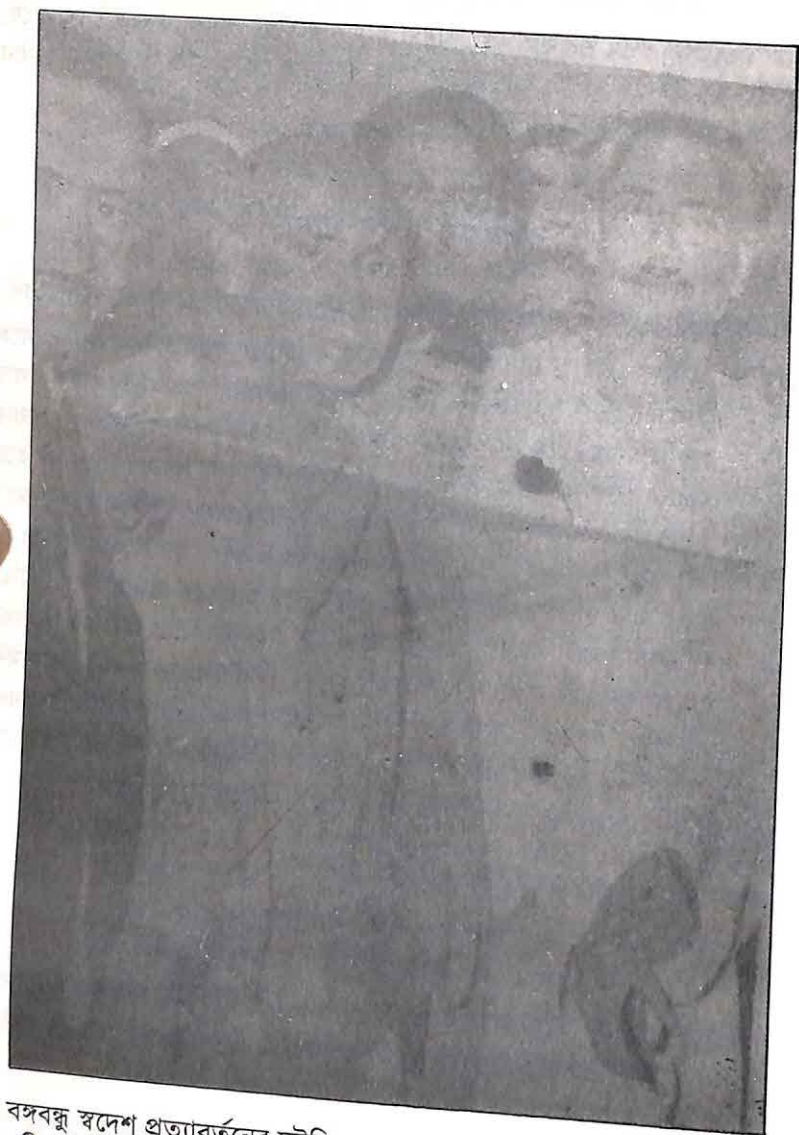
বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দুইদিন পর ১২ই জানুয়ারী ১৯৭২ ইং সকাল আট ঘটিকায় ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে গ্রন্থাকার শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের এবং সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ডি.পি. বড়ুয়া সাক্ষাৎ করেন।

ডি, পি, বড়ুয়া এবং ভিক্ষু অমৃতানন্দ। আমি যখন বঙ্গবন্ধুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম-তখন আমার এক পার্শ্বে বঙ্গবন্ধুর তদানীন্তন প্রেস সেক্রেটারী জনাব আমিনুল হক বাদশা ও আরেক পার্শ্বে মুজিব নগরে পরিচিত একজন বন্ধু। জনাব বাদশা বঙ্গবন্ধুর কাছে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং বাংলাদেশ আন্দোলনে আমার ভূমিকা সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করলেন। তখন বঙ্গবন্ধু আমাকে বক্ষে জড়িয়ে ধরলেন। আমিও তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম এবং বললাম-"না, না আমি বাংলাদেশের জন্য কিছু করতে পারিনি, তবে দেশ বিদেশে গিয়ে মানুষের কাছে বাংলাদেশের জন্য কেঁদেছি।" তিনি আমার কথায় খুব আনন্দবোধ ও বিস্ময় প্রকাশ করলেন। কিছুক্ষণ পরে আমাকে ছেড়ে অন্যান্য দর্শন প্রার্থী লোকের প্রতি মনোনিবেশ করলে তাঁর বাসভবন ত্যাগ করে চলে আসি।

সারাদিন আমি প্রচার সংঘের সাধারণ সম্পাদক মিঃ ডি, পি, বড়ুয়ার পরামর্শে তাঁর বাস ভবনে বসে বসে বিদেশে আমার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈয়ার করতে লাগলাম। সন্ধ্যার সময় মিঃ বড়ুয়া হঠাৎ বাসায় এসে আমাকে বললেন-ভন্তে, আপনাকে এক্ষনি ঢাকা বেতারকেন্দ্রে যেতে হবে। বেতারে ত্রিপিটক পাঠের এক প্রোগ্রাম করতে হবে। এই বলে তিনি আমাকে নিয়ে ছুটলেন বেতার কেন্দ্রে। বেতার কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া মাত্রই আমাকে পাঁচ মিনিটের এক লেখা তৈরীকরে মাইক্রোফোনে পাঠ করতে হলো। এতে প্রোগ্রাম সংগঠকগণ সন্তুষ্ট হলেন। সেইদিন হতে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে ত্রিপিটক পাঠের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করা হয়। আমি প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৬টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ ত্রিপিটক থেকে সত্যের চিরন্তনী বাণী প্রচার করতে থাকি। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিদিন সকালে পবিত্র কোরান, ত্রিপিটক, গীতা ও বাইবেল এই চার ধর্মগ্রন্থ থেকে শ্রোতাদের জন্য বাণী চিরন্তনী প্রচারিত হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে অনুরোধ আসে আমি সেখানেও যেন ত্রিপিটক পাঠ আরম্ভ করি। টেলিভিশনে ত্রিপিটক পাঠ কয়েকমাস চলতে থাকে। এরপর টেলিভিশনে প্রোগ্রাম চালানো আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। আমি মাসের অধিকাংশ সময় মফঃস্বলে কাটাই। কাজেই কর্মকর্তারা টি,ভি, প্রোগ্রাম অন্যান্য লোকজন দ্বারা চালিয়ে নিয়ে থাকেন।

ক্ষয় ক্ষতির জরীপ অভিযান

এদিকে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে এক অনুরোধ এল, আমাকে হানাদার বাহিনীর বৌদ্ধ নিপীড়ন সম্পর্কে দেশব্যাপী সরেজমিনে তদন্ত করে এক রিপোর্ট প্রদান করতে হবে। এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকৃত বাংলাদেশে নয় মাস যাবৎ গণ হত্যা, অত্যাচার ও অবিচার চলাকালে পাক হানাদার বাহিনী, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর যে ভয়াবহ নিপীড়ন চালিয়েছে সেই সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমি এক ব্যাপক জরীপ কাজ চালিয়েছি। আমার পরিচালনায় প্রচার সংঘের বিভিন্ন টিমসহ আমি প্রায় এক মাস যাবত চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লা, পার্বত্য চট্টগ্রামের বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো সফর করে তা থেকে হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ, বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস, বুদ্ধ মূর্তি ভগ্ন ও অপহরণের এক মর্মান্তিক তথ্য সংগ্রহ করেছি।

তদন্তের প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সহ-সভাপতি বাবু বিজয়শ্রী বড়ুয়া ও সাধারণ সম্পাদক মিঃ ডি,পি, বড়ুয়া ও আমি সীতাকুন্ড ও মিরেশ্বরাই থানার অন্তর্গত বিধ্বস্ত বৌদ্ধ গ্রাম ও মন্দিরগুলো পরিদর্শন করেছি এবং সরেজমিনে অত্যাচার ও লুণ্ঠনের তথ্য সংগ্রহ করেছি।

তদন্তের দ্বিতীয় পর্যায়ে কুমিল্লা জিলার স্বেচ্ছাসেবক প্রধান ও লালমাই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার (বর্তমানে এম পি) ও লাকসাম থানা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জনাব মকবুল আহমদ সাহেব সহ আমি কুমিল্লা, নোয়াখালী জিলার সোনাইমুড়ী প্রভৃতি গ্রামের নিহত ও কবরে প্রোথিত লোকজনের কবর খনন পূর্বক কঙ্কাল উদ্ধার করে ফটো তোলা হয়। ভস্মীভূত বাড়ী ঘর, চূর্ণ-বিচুর্ণ বুদ্ধমূর্তি, ভগ্ন বিধ্বস্ত বিহার মন্দির প্রভৃতির ফটো তোলা হয়। আমি ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ লিখলাম ও তার পরিমাণ নির্ধারণ করলাম।

তদন্তের তৃতীয় পর্যায়ে তথ্য মন্ত্রণালয় বৌদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলের হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহ-দাহ, বিহার ধ্বংস, বুদ্ধমূর্তি ভগ্ন ও ক্ষয়ক্ষতির উপর ভিত্তি করে এক প্রামান্য ফিল্ম তৈরী করার উদ্দেশ্যে দুইজন ক্যামেরাম্যান, আমার সাথে পাঠালেন। আমি কুমিল্লা, নোয়াখালী জিলায় জরীপের কার্য সমাপ্ত করে জনাব মকবুল আহমদ সাহেব ও দুইজন ক্যামেরাম্যান নিয়ে চট্টগ্রামভিমুখে রওনা হওয়ার প্রোগ্রাম করলাম। সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয় যে, অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার এম এ, এম পি ও আমাদের অনাথ আশ্রম কমিটির চেয়ারম্যান আমার এই সফর আনন্দপূর্ণ, ত্বরান্বিত ও সাফল্য মন্ডিত করে তোলার উদ্দেশ্যে দুইজন দক্ষ ড্রাইভার সহ একটি মজবুত জিপগাড়ী পনের দিনের মেয়াদে আমাকে দিয়ে দিলেন। অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদারের এই সৌজন্যের সুযোগে আমি দুর্গত বৌদ্ধ এলাকার ক্ষয়-ক্ষতি, ধ্বংস, হত্যার বিস্তৃত তথ্য নিরুপণের জন্য ব্যাপক সফর শুরু

করলাম। প্রথমতঃ চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষ করে মিরেশ্বরাই, সীতাকুণ্ড, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, চকরিয়া, রামু, উখিয়া, কক্সবাজার, মহেশখালী দ্বীপ নীলা এবং বার্মা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী অঞ্চল টেকনাফ, পার্বত্য চট্টগ্রামের রামগড় প্রভৃতি বিভিন্ন দুর্গত বৌদ্ধ অঞ্চল পরিদর্শন করে ক্ষয়ক্ষতি, ধ্বংস ও হত্যার এক মর্মান্তিক তথ্য সংগ্রহ করেছি। আর সহযাত্রী ফ্লিম টিম বৌদ্ধ নিপীড়নের ডকুমেন্ট হিসাবে অনেক প্রামান্য ছবি তৈরী করেছেন। এই ছবি প্রয়োজনবোধে ভবিষ্যতে দেশ বিদেশে প্রদর্শিত হবে এবং নির্ণীত ক্ষয়ক্ষতির, ধ্বংসের বিবরণ প্রকাশিত হবে। এই হলো আমাদের ও সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। পনরদিন ব্যাপী সফরান্তে চট্টগ্রাম শহরে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের আঞ্চলিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এক কর্মী সম্মেলনে সফরকালীন অভিজ্ঞতার লোমহর্ষক বিবরণ ও তথ্য পেশ করে বললাম যে, জল্লাদের কোন ধর্ম নেই, জল্লাদের জাতি বা সম্প্রদায়ও নেই। জল্লাদ বাহিনী নারী পুরুষ শিশু যুবা নির্বিশেষে বর্ণ, গোত্র ও ধর্ম নির্বিশেষে যে ভয়াবহ ধ্বংস যজ্ঞ চালিয়েছে, তার সঠিক বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যের অতীত। তবে সংক্ষেপে এই বলতে পারি যে, তাদের এই নৃশংসতার ফলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পাঁচ কোটি টাকার সম্পদ লুণ্ঠিত ও বিধ্বংসিত হয়েছে। অন্ততঃ বিশটি মঠ মন্দির বিহার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে। সহস্রাধিক নারীকে ধর্ষণ করেছেন। হাজার হাজার বাড়ীঘর ভস্মীভুত করেছে।

দখলদার বাহিনীর আমলে জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু পাকিস্তান বেতার কেন্দ্র থেকে "পাকিস্তান রক্ষার জন্য বৌদ্ধদের শেষ রক্ত বিন্দু দান করবে, শত্রু সৈন্য (মুক্তিযোদ্ধা ও মিত্রবাহিনী) পরাজিত হওয়ায় বৌদ্ধেরা আনন্দিত ও গৌরবান্বিত, পাকিস্তানে বৌদ্ধরা সুখে শান্তিতে আছে, বৌদ্ধরা দেশ ত্যাগ করেনি" ইত্যাদি বলে বহুবার ভাষণ দিয়েছিলেন। আমার এই সরেজমিনে তদন্ত ও সফরের ফলে প্রমাণিত হল যে, তাঁর বেতার বিবৃতি সর্বৈব মিথ্যা। তাঁর সকল কর্মতৎপরতা, হত্যাকারী, অত্যাচারী মানবতা বিরোধী শাসনের পক্ষে, নিরস্ত্র নিরীহ অত্যাচরিত ও ন্যায্য স্বাধীনতা লাভের দাবীদার বাঙালীর বিরুদ্ধে এই কলঙ্ক ঢাকা দেওয়ার জন্য এখন তিনি যত প্রকার প্রচেষ্টা চালান না কেন, তাঁর সব প্রচেষ্টা ও ঘটনা বাংলার বৌদ্ধ তথা সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস প্রণেতা বাঙালী মাত্রই সম্যকরূপে অবগত আছেন ও থাকবেন। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধের এইসব বিবৃতির মূল্যে, বৌদ্ধ সমাজ রক্ষার ফলে তাঁর রাষ্ট্রীয় প্রেরণা, সামাজিক কোন চেতনা কিংবা প্রাণের দরদ নিয়ে তিনি যে অগ্রসর হয়েছিলেন, এমন নহে, তাঁর প্রত্যেক পদক্ষেপের মূল উদ্দেশ্য ছিল কায়েমী স্বার্থ সিদ্ধির জঘন্য সন্ধান।

কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন বিধ্বস্ত অঞ্চল সফর করে আমার এই অভিজ্ঞতা ও জন্মেছে যে, বাংলাদেশ মুক্তি আন্দোলনে বৌদ্ধদের অবদান কম

নহে। বরং এই কথা বলা চলে যে, অন্যান্যদের তুলনায় জন সংখ্যানুপাতে শতকরা হারে বৌদ্ধদের ত্যাগ অনেক বেশী। আমি সমগ্র বৌদ্ধ অধ্যুষিত অঞ্চল পরিভ্রমণ করে এই তথ্যও সংগ্রহ করেছি যে কয়েকশত বৌদ্ধ যুবক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রণ করেছেন। বহু যুবক মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন ও মর্যাদা রক্ষার জন্য শহীদ হয়েছে। প্রায় বৌদ্ধ বিহারই ছিল মুক্তিযোদ্ধার গোপন দুর্গ ও হিন্দু, মুসলমান আশ্রয়প্রার্থী বহু লোকের জীবন রক্ষার আশ্রয়স্থল। চট্টগ্রামে বৌদ্ধ গ্রামের প্রতিটি বিশিষ্ট বাড়ীতে আওয়ামী লীগ পন্থী ও বিশিষ্ট সমাজকর্মী মুসলিম বন্ধু বড়ুয়াদের আত্মীয় বলে পরিচয় প্রদান করে পাক সেনাদের আত্মসমর্পনের পূর্ব পর্যন্ত নিরাপদে অবস্থান করেছেন। বহু বড়ুয়া ডাক্তার মুক্তি যোদ্ধাদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেছেন। যে সকল বিহারে মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে সকল গ্রামের বৌদ্ধরা চাঁদা করে তাদের আহার বিহারের ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত কদুরখীল বৌদ্ধ গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে বেশ কিছুদিন ছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ একটি মাত্র কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উখিয়া থানার রত্নপালং গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রী যোগেন্দ্র সিকদার তাঁর পাহাড়ের অভ্যন্তরস্থ খামার বাড়ীতে ৫০ জন মুক্তিযোদ্ধাকে কয়েকমাস যাবত স্থান দিয়েছিলেন এবং তাদের সকল প্রকার জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। পাক বাহিনী এই খবর জানতে পেরে সিকদার মহাশয় ও তাঁর আত্মীয় পরিজনের লাখ লাখ টাকা মূল্যে রেঙ্গুনী সেগুন কাঠের তৈরী বাড়ী ঘর ও ধন সম্পদ অগ্নি সংযোগ করে ভস্মীভুত করেছে। আক্রোশের বহ্নি এখানেই নিভেনি। ক্রোধান্ধ হয়ে পাক সেনারা বহুদিন ধরে সিকদার ও তাঁর জ্ঞাতি বর্গকে খোঁজাখোঁজি করেছে। কিন্তু তখন সিকদার মহাশয় সদল বলে বার্মা সীমান্তে বাস করছিলেন। এছাড়াও রাউজান থানাধীন বিনাজুরী, আবুরখীল, গুজরার বড়ুয়া গ্রামে মুক্তিযুদ্ধের আশ্রয় কেন্দ্র ছিল। তাই বলি মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণে, মুক্তিযোদ্ধার সকল প্রকার সহযোগিতায়, দেশ বিদেশ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বপক্ষে জনমত গঠন ও স্বীকৃতি লাভের সন্ধানে সংখ্যানুপাতে বৌদ্ধদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ও অবদান অত্যধিক বেশী।

কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার বিস্তার্ণ এলাকায় মোট ২৩ দিন সফরান্তে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে তথ্য মন্ত্রণালয়ে সফরকালীন কর্মসূচীর একটা পুর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রদান করি। সহযাত্রী ফিল্মটিম ও তাদের কর্ম তৎপরতার রিপোর্ট প্রদান করলেন। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে তথ্য মন্ত্রণালয় একটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম প্রস্তুত করে দেশ বিদেশে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। পরে বৌদ্ধদের উপর নির্মম নির্যাতনের রূপরেখা ১৯৭২ ইংরেজী মে মাসে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ববৌদ্ধ সম্মেলনে পেশ করেছি।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি সকাশে

২৪শে ফেব্রুয়ারী আমি ও বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সাধারণ সম্পাদক মিঃ ডি,পি, বড়ুয়া বঙ্গ ভবনে রাষ্ট্রপতি জনাব বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হই এবং বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে বৌদ্ধরা যে সর্বতোভাবে অংশগ্রহণ করেছে, কয়েকশত বৌদ্ধ যুবক যে মুক্তি বাহিনীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে এবং বৌদ্ধ নিপীড়ন সম্পর্কে আমার ২৩ দিন ব্যাপী সফরের অভিজ্ঞতা রাষ্ট্র প্রধানের নিকট পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা প্রদান করলে তিনি বললেন, বাংলাদেশ একটা ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং এখানে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সব সম্প্রদায়ের লোকের সমানাধিকার রয়েছে। ইতিমধ্যে নূতন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানানোর জন্য আমি পৃথিবীর বৌদ্ধ দেশ সমূহকে আবেদন জানাই। ১৬ই এপ্রিল ১৯৭১ সন, পাক সামরিক বাহিনীর লোকেরা গ্রামের সমীপর্বতী নদীর পাড়ে এসে আমার নাম ধরে জিজ্ঞেস করল তচ্ছ্রবনে আমিতো আতংকিত যে, নদী পাড় হয়ে বরইগাঁও পৌঁছতে পারলে আমাকে খতম করে ফেলত। কিন্তু অনেকে মনে করেছে,-না- আপনাকে খোঁজ করেছে তাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য। পক্ষপাতিত্বে নেওয়ার জন্য এর আগেই মাননীয় বিশুদ্ধানন্দ মহাথের সামরিক জান্তার খপ্পরে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে ঢাকার বক্ষে হাতের কাছে পাওয়া গিয়েছে। আমি গ্রাম দেশে ছিলাম বলে আমাকে কবজা করতে পারেনি। নয় মাস অবধি মহাথের দ্বারা যা খুশী তা করতে বাধ্য করেছে। যখন যে বিবৃতি দিবার প্রয়োজন সেই বিবৃতি দিতে, যেখানে যাওয়ার প্রয়োজনে সেখানে যেতে, যা বলার তা বলতে বাধ্য করেছে। সাধ্য আছে? সামরিক শাসনের নির্দেশ অমান্য করেন। কোনরূপ অমান্য করলে তৎমুহূর্তে ধরাশায়িত হতে হতেন। মাননীয় মহাথের মানুষের বাড়ী ঘর ব্যাংক লুট করেননি। গণহত্যা করেননি। শিশু সন্তানকে পুকুর বা নদীতে নিক্ষেপ করেননি। মানুষের বাড়ী ঘর পোড়াননি। সামরিক জান্তার হুকুম তামিল করতে বাধ্য হয়েছেন। এজন্য সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যার পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন বারংবার। তথাপি দেশে বিদেশে সমাজে তিনি পাকিস্তানের দালালী করেছেন বলে একটা বদনাম আছে। আমি বিদেশে পলায়ন করেছিলাম বলে সত্যের পক্ষে মিথ্যা, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ পেয়েছি। মাতৃভূমির শান্তি, স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করতে সক্ষম হয়েছি। মহাথের মহোদয় পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে শেষ পর্যায়ে 'চীনা বৌদ্ধ' নামে পরিচয় পত্র প্রদানে শত শত লোকের প্রাণ রক্ষা করেছেন। এই পরিচয় পত্র প্রদানের উৎস হচ্ছে ব্যাংকক অর্থাৎ বিশ্ববৌদ্ধ জনমতের প্রভাব। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ সৃষ্টি। নচেৎ চার সম্প্রদায়ের অধ্যুষিত পূর্ব পাকিস্তানে শুধু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি এত দরদের কি কারণ

ছিল? তিনি কাজ করলেন দেশে, আমি কাজ করলেম মাতৃভূমির শান্তি, স্বাধীনতার পূর্ণ সমর্থকরূপে বিদেশে। কিন্তু কই? কারো ভাগ্যেই জুটলনা কোন দিক থেকে লাভ বা পুরস্কার। আমার বিদেশ ভ্রমণের সাথী এটর্নি জেনারেল ফকির শাহাবুদ্দিন সাহেব, জহুর আহম্মদ চৌধুরী, এম, আর, ছিদ্দিকী, শিক্ষা মন্ত্রী ইউসুফ আলী, সাবেক এম, পি, আবুল কালাম মজুমদার প্রভৃতি মহান ব্যক্তিত্বের পরামর্শেও সুপারিশে Work Minister জনাব মতিয়ুর রহমানের নিকট একটা পরিত্যক্ত বাড়ীর জন্য আবেদন করেছিলাম। Minister সাহেব ঢাকার ডি,সি,মোঃ কামাল সাহেবের নিকট দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অবশেষে মাননীয় ডি,সি, সাহেব একজন বৌদ্ধ অফিসারের উপর কার্য্যকরী ব্যবস্থার জন্য সেই নির্দেশিত দায়িত্ব আকাশে বিলীন হয়ে গেল। অথচ যারা হাজার হাজার মানুষ মেরে ফেলল, মানুষের বাড়ী ঘর, ব্যাংক লুট, টাকা পয়সা জোর জুলুমে তছরূপ করল, তারা বাংলাদেশের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, এমনকি মন্ত্রীত্ব লাভের সৌভাগ্যও অর্জন করলেন। মহাথের মহোদয় ও অন্যান্য বৌদ্ধরা মিথ্যা বিবৃতির পালটা জবাব বা প্রতিবাদ জ্ঞাপনার্থ বাংলাদেশ অস্থায়ী সরকার আমাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ রাষ্ট্র সমূহে পাঠিয়ে ছিলেন। আমি বিদেশের কর্তব্য সম্পন্ন করে ফিরে আসার পর আমার বিবৃতি, স্বাধীনতার স্বপক্ষের কার্যকলাপের পালটা জবাব বা প্রতিবাদ জানাবার জন্য ইয়াহিয়া খান রাজা ত্রিদিব রায়কে বিদেশে পাঠালেন। রাজা ত্রিদিব রায় সিংহল পৌঁছার সাথে সাথে ঢাকায় নিয়াজী সাহেব আত্মসমর্পণ করে মুক্ত হয়ে গেলেন। রাজা মহাশয় অদ্যাবধি দেশে আর ফিরে এসে স্বাধীন বাংলার মুখ দেখলেন না।

উপসংহার

কাল রাত্রির তিমির অতিক্রম করে মুক্ত স্বদেশ ভূমিতে আমরা আজ উদ্ভাসিত। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয় আমাদের রক্তাক্ত সংগ্রামের এক ঐতিহাসিক ফলশ্রুতি। স্বেচ্ছাচারী শাসনের অবসানের পর ব্যাপক মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ এক নূতন বাঙালী জাতি জন্মলাভ করল। এখানে ধর্ম কিংবা বর্ণ জাতির ভিত্তি নেই। বরং ধর্মের অন্ধতা ও এক নায়কত্বের তথাকথিত লৌহ শৃঙ্খল ভেঙ্গে সব ভাষা সম্পন্ন এক বিরাট মানবগোষ্ঠী নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন এক নূতন জাতির বুনিয়াদ রচনা করল। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা প্রতিটি বাঙালী নুতন সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তির জন্য লড়াই করেছি। জল্লাদের হিংস্রতা সেই চেতনাকে স্তব্ধ করতে পারেনি। পৃথিবীর ইতিহাসে জঘন্যতম গণ হত্যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে রক্তের সমুদ্র পেরিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালী এক নুতন সত্তা নিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করল। আজকে স্বাধীনতার রক্তাক্ত ইতিহাস স্মরণ করে আমি শ্রদ্ধা জানাই দেশ মাতৃকার বেদীমূলে নিবেদিত অগণিত বীর শহীদের। অশ্রুর অক্ষরে স্মরণ করছি ঘাতকের অস্ত্রে

নিশ্চিহ্ন লাখ লাখ বাঙাগলীকে আর অভিনন্দন জ্ঞাপন করি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। এর সাথে ক্ষুদ্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত যে সকল যুবক মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে শহীদ হয়েছেন, আমি তাঁদেরকে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বৌদ্ধ যুবকগণকে বিশেষরূপে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজকের ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ মানবতারোধে অনুপ্রাণিত। ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের নূতন অণ্বেষায় বাঙালী তার প্রাচীন সংস্কৃতিকে আবিষ্কার করেছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টানের সম্মিলিত স্রোত ধারায়। বাংলার পলি মাটিতে যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির উত্থান পতন ঘটেছে এবং এর মাধ্যমে সমন্বয় ও সঙ্গীকরণের নূতন ভাবধারা রচিত হয়েছে। বাংলার ঐতিহ্য নির্মানে বৌদ্ধ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এক বিস্তীর্ণ অধ্যায় জুড়ে রয়েছে। হাজার হাজার বছরের বেশী সময় ধরে সাহিত্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির বিকাশে বৌদ্ধ মতবাদ একটা অবিচ্ছিন্ন বিচিত্র ধারার সৃষ্টি করেছে। বাঙালী সংস্কৃতির নূতন মূল্যায়ন এবং ঐতিহ্য অণ্বেষায় আজ নূতনভাবে বিচার হবে। তাই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অঙ্গণে আজ আমরা মুক্ত বিচার ও মানবতাবাদী চিন্তার ভিত্তিতে এক প্রগাঢ় ঐতিহ্যবোধে সংস্থিত।

রাজনৈতিক অঙ্গণে ধর্মভিত্তিক ভাবাদর্শের বিলুপ্তি ঘটেছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাঙালী জাতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ আচারে, ব্যবহারে অভ্যাসে, রুচিতে ও বৃহত্তর জীবন চর্চায় আজ আমরা সবার সাথে একাত্ম। তবু ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সহ অবস্থান ও বিকাশ এক বাস্তব সত্য। তাই বাংলাদেশের নূতন পরিবেশে বৌদ্ধেরা তাদের বিহারে, কেন্দ্রে ও সমাজ জীবনে নিজেদের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক চর্চার এক অনন্য অভুতপূর্ব সংযোগের অধিকারী হবে। পাকিস্তানের চব্বিশ বৎসরের হীনমন্যতাকে পরিত্যাগ করে এক নুতন উজ্জীবনের মাধ্যমে এসে আমরা পৌঁছেছি। বিশ্বে কোটি কোটি বৌদ্ধ জনসাধারণের সামনে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ সম্প্রদায় এক নুতন আলোকে উদ্বাসিত হবে। বাংলাদেশ এক নব মর্যাদায় বৌদ্ধ দেশ সমূহের সামনে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। ঐতিহ্যবাহী বৌদ্ধ সম্প্রদায় সে সম্পর্কের নূতন সূত্র রচনা করতে সক্ষম হবে।

আমাদের চিন্তা ও চেতনা যেমন বাঙালীদের প্রগাঢ় অনুভূতিতে লালিত হবে তেমনি সংস্কারমুক্ত পরিবেশে স্বাধীনতার যে আলো আমাদের দুয়ারে উদ্ভাসিত সে আলোর প্রেরণায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় নূতন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে। আজ যাত্রা শুরুতে সেইটাই হোক আমাদের উদ্বোধনী সুর।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

সব্ব দানং ধম্ম দানং জিনাতি

"বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে" গ্রন্থের মুদ্রণ খরচ বাবৎ যাঁরা অর্থ সাহায্য করেছেন তাঁদের নাম-ঠিকানা ও সাহায্যের পরিমাণ–

ক্রম	নাম	ঠিকানা	পরিমাণ
১।	ডাঃ প্রীতিপ্রসূন বড়ুয়া ও মিসেস রেণূ বড়ুয়া	ইছামতি, রাঙ্গুনীয়া	১০০০/-
২।	ডাঃ আমিনুল হক, ই,এম, এস,	বরইগাঁও, লাকসাম	১০০০/-
৩।	বাবু রতন সিংহ	দুপচর, লাকসাম	১৫০০
৪।	মিঃ নীহার রঞ্জন সিংহ, এয়ার পোর্ট সেইন্ট ইঞ্জিনিয়ার	পাড়া বাকই, লাকসাম	২০০০/-
৫।	বাবু নয়ন বড়ুয়া	উনাইন পুরা, পটিয়া	৫০০০/-
৬।	বাবু কমলাংশু বড়ুয়া, প্রকৌশলী	রাউজান, চট্টগ্রাম	১০০০/-
৭।	বাবু নীল মোহন বড়ুয়া ও মিসেস লক্ষ্মী রাণী বড়ুয়া	মতৈন, সেনবাগ, নোয়াখালী	৫০০/-
৮।	বাবু সুরেশ চন্দ্র বড়ুয়া	কৌশল্যার বাগ, সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী	২০০/-
৯।	মিঃ ফণি ভূষণ বড়ুয়া, অতিঃ প্রধান উৎপাদন ব্যবস্থাপক, কে, আর, সি, মিঃ, চন্দ্রঘোনা।	দমদমা, মিরেরসরাই, চট্টগ্রাম	২০০০/-
১০।	বাবু শাক্যপদ বড়ুয়া (শিক্ষক)	পশ্চিম বিনাজুরী, রাউজান	১০০০/-
১১।	বাবু বাদল বড়ুয়া,	ডোমখালী, রাউজান	১০০০/-
১২।	অমৃত রঞ্জন বড়ুয়া, অবসর প্রাপ্ত ফার্মাসিষ্ট	রাজানগর, রাঙ্গুনীয়া	২৫০/-
১৩।	সুর-শ্যাম কল্যাণ ট্রাষ্ট (বিজয়, রণজয়, রাণী ও অজয়)	গুমানমর্দ্দন, হাটহাজারী	১০০০/-
১৪।	বাবু স্বপন সিংহ	দুপচর, লাকসাম	৩০০/-
১৫।	বাবু হিমাদ্রী বড়ুয়া	বাথুয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম।	২০০/-
১৬।	বাবু হারাধন দে, চীপ একাউন্টেন্ট, রবীনসন্স বাংলাদেশ লিঃ	নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম	১০০০/-
১৭।	বাবু মানবেন্দ্র ও উপমা বড়ুয়া	দমদমা, মিরেরসরাই	১০০০/-
১৮।	বাবু প্রদীপ কুমার বড়ুয়া (প্রবর্তক কলোনী)	বেলখাইন, পটিয়া	১০০০/-
১৯।	বাবু সুকুমার বড়ুয়া ও মিসেস জয়ন্তী রাণী বড়ুয়া	পশ্চিম বিনাজুরী, রাউজান	১০০০/-
২০।	বাবু আশুতোষ বড়ুয়া	আধার মানিক, রাউজান	৫০০/-

[অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার, প্রাক্তন সংসদ সদস্য, কুমিল্লা এবং মোঃ জহিরুল ইসলাম, ডেপুটি কমাণ্ডার, কুমিল্লা জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক লিখিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত মহাথের মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত উক্ত গ্রন্থে সংযোজিত হল।]

জ্যোতিঃপাল মহাথের আন্তর্জাতিক সুবর্ণ পদকে অভিষিক্ত ও সম্বর্ধিতঃ

অধ্যক্ষ, আবুল কালাম মজুমদার

প্রাক্তন সংসদ সদস্য, কুমিল্লা।

১৯৭৯ সনের জুন মাসে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাটোরে এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব ও পঞ্চম সাধারণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে তথাগত বুদ্ধের শান্তি, মৈত্রী, অহিংসার বাণী প্রচারে অনন্য সাধারণ অবদান রাখার জন্য জ্যোতিঃপাল মহাথের মহোদয়কে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ শান্তি পদক ও সনদে ভূষিত করা হয়, অথচ এই সম্মেলনে মহাথের অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। মহাথের মহোদয় ছিলেন এই সংস্থার বাংলাদেশ জাতীয় কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। যে কারণে তিনি মঙ্গোলিয়া যেতে পারেন নি, সেই কারণ বড়ই সঙ্গীন। তার কতক বর্ণনা করা এক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধ করছি, কারণ হচ্ছে এইঃ—

যখন যে কোন দেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যায় তখন সে দেশ থেকে আমন্ত্রিত দেশের প্রতিনিধিগণকে যথাসময় আমন্ত্রণ পত্র দিতে হয়, এবং টিকেট পাঠাতে হলে পাঠিয়ে দেয়। সাথে সাথে আমন্ত্রিত দেশের সরকারকে অবগত করে পত্র দিতে হয়। আমন্ত্রিত দেশের সরকারকে অবগত না করলে সরকার ইচ্ছা করলে নিজ দেশের প্রতিনিধি দলের সম্মেলনে যোগদান বন্ধ করে দিতে পারেন। সরকারী অনুমোদন না পেলে কোন দেশের প্রতিনিধি দল বিদেশী কোন সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন না। এই হচ্ছে নিয়ম।

১৯৭৯ সনে মঙ্গোলিয়া এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার প্রধান কার্যালয় উলান বাটোর থেকে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে আমন্ত্রণ জানান এবং পাঁচ জনের জন্য পাঁচটি টিকেট পাঠান, কিন্তু এই সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারকে অবগত করে কোন পত্র দেননি। জ্যোতিঃপাল মহাথের বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা ও বাংলাদেশ জাতীয় কেন্দ্রের সভাপতি হিসাবে যখন স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ে অনুমতির জন্য আবেদন করলেন, তখন তিন মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রীগণ যৌথ স্বাক্ষরে নিষেধ করে দিলেন যে, এই প্রতিনিধি দলকে বিদেশ যেতে অনুমতি দেওয়া হবে না। যেহেতু, মঙ্গোলিয়া থেকে সরকারীভাবে কোন চিঠিপত্র পাওয়া যায়নি। এদিকে মহামান্য সংঘরাজ শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবিরকে পাঁচ-সাত দিন আগেই মঙ্গোলিয়া নেবে আশ্বাস দিয়ে ঢাকা নিয়ে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি যদি ঢাকা থেকে দেশে ফেরত যান তবে তো সারা বৌদ্ধ সমাজে এক সাথে ঘন্টা বেজে উঠবে। কাজেই সরকার থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে প্রতিনিধি দলের কারো গায়ে জ্বর আসল কেউ বাসায় গিয়ে সারাদিন স্নানাহার বন্ধ করে চক্ষু মুদিত করে বিছানায় পড়ে রইল। কারো মুখমন্ডলে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার নেমে আসল। কিন্তু কেউ নিরস্ত হয়নি। মহাথেরর পকেটে ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বড় ভাই মোকলেছুর রহমানের এক চিঠি। সেই চিঠি নিয়ে অন্তিম প্রচেষ্টায় নেমে গেলেন মহাথের। মহাথের দেবপ্রিয় বাবুকে সাথে করে জনাব মোকলেছুর রহমানের ছোট ভাই রফিকুর রহমানের সিদ্ধেশ্বরী বাড়ীতে গিয়ে পৌছলেন। জনাব রফিক সাহেবকে প্রতিনিধি দলের বিপদের কথা আদ্য-পান্ত সব জানালেন এবং তাঁদের বড় ভাই মোকলেছুর রহমানের চিঠিখানা দেখালেন। রফিক সাহেব চিঠিখানা পাঠ করে তৎক্ষণাৎ মহাথেরকে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বেলী রোডস্থ বাসভবনে। রফিক সাহেব মহাথেরকে সাথে করে পাকের ঘরের পিছনের সিড়ি বেয়ে যখন দোতলায় গিয়ে পৌছলেন তখন

রাত ৯টা। মন্ত্রী মহোদয় জ্যোতিঃপালকে দেখেই মুস্কি হেসে দিলেন এবং বলতে লাগলেন যে, তিন মন্ত্রণালয়ের যৌথ নিষেধ। এটা আর কিছু করা যাবে? অমনি জ্যোতিঃপাল মহাথের বড় ভাই মোকলেছুর রহমানের চিঠিখানা মন্ত্রীর হাতে দিলেন। চিঠিখানা পাঠ করে তিনি জিজ্ঞেস করলেন– সকাল বেলায় এই চিঠি কোথায় ছিল? জ্যোতিঃপাল মহাথের বললেন- 'চিঠিখানা বাসায় ছিল, আমার আনতে খেয়াল ছিল না।' মন্ত্রী মহোদয় এই বলে বিদায় দিলেন যে, আগামী দিন সকাল আটটায় আমার অফিসে আসবেন। পরদিন বৃহস্পতিবার ব্রহ্মদত্ত বাবুকে নিয়ে আটটায় অফিসে পৌছলেন। মন্ত্রী মহোদয় মহাথের জ্যোতিঃপালের আগেই অফিসে হাজির। অতঃপর তিনি প্রধান মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে প্রতিনিধি দলকে বিদেশ যাওয়ার অনুমতি প্রদান করলেন। সেই দিন ৬টায় রাশিয়ার বিমান এরোফ্লোট, এই বিমানে যেতে না পারলে পরবর্তী বিমান সোমবার সন্ধ্যায়। সোমবার পর্যন্ত অনুষ্ঠান প্রায় সমাপ্ত। কাজেই অদ্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ছয়টায় এরোফ্লোট ধরতেই হবে। কিন্তু প্রতিনিধি দলের সম্মুখে আরেক মহাসমস্যা। মঙ্গোলিয়া যাওয়ার জন্য প্রতিনিধি দল প্রস্তুত। কিন্তু টিকেট এসেছে পাঁচখানা। প্রতিনিধিদের মধ্যে একজন বাদ পড়তে হয় অথবা সত্তর হাজার টাকা ব্যয় করে একখানা টিকেট ক্রয় করতে হয়। কেউ বাদ পড়তে রাজী নেই আর ৭০ হাজার টাকা ব্যয় করে বিদেশ ভ্রমণ করতেও অরাজী। এই নিয়ে বাবুদের মধ্যে ভীষণ ঝগড়াঝাটি, এমনকি পরস্পর আক্রোশ চরম পর্যায়ে। অবশেষে জ্যোতিঃপাল মহাথের স্বেচ্ছায় মঙ্গোলিয়ায় যাওয়ার ইচ্ছা বাদ দিলেন। এখন আশংকা যদি সভাপতি বা প্রতিনিধি দলের নেতা বাদ পড়েন তবে সমগ্র প্রতিনিধি দল বাতিল হয়ে যায় নাকি? অতঃপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিকট মিঃ ডি. পি. বড়ুয়া এই বলে ফোন করলেন যে, প্রতিনিধি দলের নেতা অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মঙ্গোলিয়ায় রওনা হতে অক্ষম। মন্ত্রী মহোদয় জবাব দিলেন আপনাদের নেতা অসুস্থ হয়ে পড়লে আপনারা অন্যান্য সদস্যরা চলে যান, তাতে কোন আপত্তি নাই। মহামান্য সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাস্থবিরকে প্রতিনিধি দলের নেতা করে অন্য সবায় চলে গেলেন। এখানে অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের বিষয় হচ্ছে যে, তিনি অনেক ষ্টেশন করে প্রতিনিধি দলকে বিদেশে পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। তারা যথাসময়ে মঙ্গোলিয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করলেন। প্রতিনিধি দলের নেতা জ্যোতিঃপাল মহাথের কোন দুঃখানুভব করলেন না, বরং বিপুল আনন্দ উপভোগ করলেন।

তিনদিন পরে বাংলার অবজারবভর পত্রিকায় চোখ পড়তেই দেখলেন এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার বাংলাদেশ জাতীয় কেন্দ্রের সভাপতি জ্যোতিঃপাল মহাথের আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ শান্তি সুবর্ণ পদকে ও সনদপত্রে বিভূষিত। উলান বাটোর এশীয় শান্তি সম্মেলনে মহামান্য সংঘরাজ মহাস্থবির জ্যোতিঃপাল মহাথেরর পক্ষ থেকে সুবর্ণপদক ও সনদপত্র গ্রহণ করেছেন। সম্মেলন সমাপ্তির পর সংঘরাজ মহাস্থবিরসহ প্রতিনিধিদল জাপান, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া ভ্রমণ করে যথাকালে দেশে পৌছলেন। এর কিছুদিন পর সংঘরাজ মহাস্থবির তাঁর অধ্যুষিত মির্জাপুর শান্তিধাম বিহারে এক বিরাট জনসভার আয়োজন করে জ্যোতিঃপাল মহাথেরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তি সুবর্ণ পদক ও সনদপত্র সমর্পণ করলেন। তার কিছুদিন পর বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ চট্টগ্রাম মহানগরীর ফুলকি ক্লাব মিলনায়তনে এক নাগরিক সম্বর্ধনার আয়োজন করেছিলেন। এ সম্বর্ধনা সভায় বহু বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলমান সুধী সমাগম হয়েছিল এবং এ অনুষ্ঠানেও সভাপতিত্ব করেছিলেন বাংলাদেশের বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় গুরু সংঘরাজ মহামান্য শীলালংকার মহাস্থবির মহোদয়।

পরিশেষে ১৯৭৯ সনের ৩০শে ডিসেম্বর বরইগাঁও উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মহা সমারোহের সহিত এক গণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানেও বাংলাদেশের বৌদ্ধদের সর্বোচ্চ গুরু শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির মহোদয় সভাপতিত্ব করেছিলেন। হিন্দু ,মুসলমান, বৌদ্ধ হাজার হাজার জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী জনাব এম,এ, বারী এ টি মহোদয়। ডি,আই,জি, মিঃ শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরী, কুমিল্লার ডি, সি, পুলিশ সুপার প্রভৃতি জেলা ভিত্তিক অফিসারগণ ,লাকসাম থানা ভিত্তিক

অফিসারগণ, ১নং বাঘমারা, ২নং ভৌলইন, ৩নং পেরুল, ৪নং বাকই, ৬নং পশ্চিমগাঁও প্রভৃতি ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রতিনিধিগণ নির্বিশেষে সবাই উপস্থিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রীমহোদয় মাতৃভূমির শান্তি, স্বাধীনতার পক্ষে দেশে-বিদেশে কাজ করার জন্য আন্তর্জাতিক সুবর্ণ পদক জ্যোতিঃপাল মহাথেরকে পরিয়ে দেন। সভার পরে কুমিল্লার এস, পি সাহেব প্রস্তাব করলেন যে, জ্যোতিঃপাল মহাথের যেন এখনই সুবর্ণ পদকটি নিয়ে লাকসাম থানায় অথবা কুমিল্লায় চলে যান। তাঁর প্রস্তাবে জ্যোতিঃপাল মহাথেরর মনটা কিছু সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। জ্যোতিঃপাল মহাথের তৎক্ষণাৎ সর্বজন সমক্ষে তার আত্মীয় ডি,আই,জি মিঃ শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরীর হাতে সুবর্ণ পদকটি দিয়ে দেন। চৌধুরী সাহেব ইহা কুমিল্লা নিয়ে গেলেন।

বাংলাদেশের যে ক'জন খ্যাতকীর্তি মনীষী ত্যাগদীপ্ত কর্মে ও মনস্বীতায়, উজ্জ্বল আদর্শে ও ব্যক্তিত্ব মহিমায় স্বদেশে এবং বিদেশে অত্যন্ত সুপরিচিত তাঁদের অন্যতম মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথেরো। তাঁর পরিচয়ের সীমারেখা বৌদ্ধ সমাজের গন্ডী ছাড়িয়ে সারা দেশে আজ জাতীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত। এ প্রতিষ্ঠার নেপথ্যে রয়েছে তাঁর সুদীর্ঘ তিন দশকের নিরলস সাধনা, ঐকান্তিক কর্মনিষ্ঠা এবং মহতী শুভৈষণা। তাই তিনি আজ জ্যোতির্ময় জ্যোতিঃপাল। তাঁর জীবন তাই কর্মে ও প্রজ্ঞার জ্যোতিতে যুগপৎ ভাস্বর ও দেদীপ্যমান।

জ্যোতিঃপালের জন্ম কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানার বরইগাঁও জনপদের কেমতলী গ্রামে। সেদিন ছিল রবিবার, ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসের ৫ তারিখ। তাঁর পিতার নাম চন্দ্রমণি সিংহ আর মাতার নাম দৌপদীবালা সিংহ। শিশু জ্যোতিঃপাল ক্রমে বড় হয়ে উঠেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে উচ্চতর শিক্ষা জীবন তাঁর এগিয়ে চলে।

শৈশব থেকে সংসারের প্রতি তিনি বীতরাগ, দুঃখ মুক্তির আহবান আসে তাঁর কাছে। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা নেন। পরবর্তীকালে ধর্ম বিনয় শিক্ষার প্রতি তাঁর অনুরাগ বেড়ে যায়, ১৯৩৮ সালে তিনি উপসম্পদা গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

জ্যোতিঃপালের জন্ম কুমিল্লা হলেও তাঁর প্রথম জীবনের অধিকাংশ সময় শিক্ষা ও কর্ম ব্যাপদেশে অতিবাহিত হয় চট্টগ্রামে ও কলকাতায়। আচার্য ধর্মাধার মহাস্থবিরের তত্বাবধানে তিনি পাহাড়তলী মহামুনি পালি কলেজে এবং পরে কলকাতা ও নালন্দা বিদ্যাভবনে পালি ভাষা, সাহিত্য এবং ধর্মাশাস্ত্র অধ্যয়ন অনুশীলন করে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বাংলা, পালি, সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল রয়েছে। এ জন্য সাবলীল লেখায় ও বাগ্মীতায় তিনি সমভাবে পারদর্শী। স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি ৩৩ বছর শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। এই শিক্ষকতা তাঁর পাণ্ডিত্য ও গবেষণার ভিত্তিভূমি তৈরীতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

জ্যোতিঃপাল মহাথেরো একজন প্রথিতযশা লেখক হিসেবে সকল মহলে স্বীকৃত। তাঁর রচিত, অনুদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি, কর্মতত্ত্ব, ব্রহ্মবিহার, বোধিচর্যাবতার, মালয়েশিয়া ভ্রমণ ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান-পতন, বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রভৃতি সর্বস্তরের পাঠকদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও বিদগ্ধ এসব গ্রন্থের উচ্ছসিত প্রশংসা পরিলক্ষিত হয়েছে।

পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল তাঁর জীবনকে শুধু অধ্যয়ন-অনুশীলন, শিক্ষা-দীক্ষা আর ধ্যান-সমাধিতে সীমিত রাখেননি, ছড়িয়ে দিয়েছেন, পরিব্যাপ্ত করেছেন 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' বিপুল কর্মকান্ডে, সেবা সংগঠনে ও শান্তি-মৈত্রীর বাণী প্রচারে। তাই তার খ্যাতি আজ কর্মবীর হিসেবে ও স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল। বরইগাঁও ও বৌদ্ধ বিহার পালি পরিবেন, সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র, বয়ন বিদ্যালয়, বরইগাঁও অনাথ আশ্রম, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, উচ্চ বালক বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান জ্যোতিঃপালের অদম্য কর্মশক্তির ও সাংগঠনিক প্রতিভারই সাক্ষর। জ্যোতিঃপালের ত্যাগে-শ্রমে এবং নিরন্তন প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত এসব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার দ্বার সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য অবারিত। তাই পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল সমগ্র কুমিল্লা জেলার হিন্দুদের কাছে মহান সাধু, মুসলমানদের কাছে সিদ্ধ দরবেশ এবং বৌদ্ধদের কাছে আদর্শ আর্যশ্রাবক হিসেবে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়

ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মান মর্যাদা ও সমাদর পেয়ে আসছেন। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদের সদস্য হিসাবে গত ৬ বৎসর ধরে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

জ্যোতিঃপাল মহাথের বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সাথে সুদীর্ঘকাল ধরে জড়িত রয়েছে। প্রথমে তিনি এ সংস্থার সহ সভাপতি ছিলেন, পরে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তিনি এ সংস্থার সভাপতি নির্বাচিত হন। সেই থেকে অদ্যাবধি সভাপতির গুরু দায়িত্ব, তিনি নিষ্ঠা সহকারে পালন করে যাচ্ছেন। ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার বাংলাদেশ জাতীয় কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলে তার দায়িত্ব ও কর্মতৎপরতা আরো বেড়ে যায়।

ইতিপূর্বে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জ্যোতিঃপাল এই সংস্থার সভাপতি হিসেবে যে ভূমিকা পালন করেন তা বাঙালী জাতির স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় হিসাবে পরিগণিত হবে। জ্যোতিঃপাল সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম কালে প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে, তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে বিশ্বের বিভিন্ন বৌদ্ধ দেশ সমূহ সফর করে বাংলাদেশের স্বপক্ষে জনমত গঠনে ও স্বীকৃতির সন্ধানে তৎপর হন। তিনি তৎকালীন পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নৃশংস নির্যাতন ও ধ্বংসলীলার লোমহর্ষক বিবরণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্ভয়ে প্রচার করেন, তাঁর ভূমিকা সেদিন ছিল বিবেকের কণ্ঠস্বর হিসেবে, তিনি অকুতোভয়ে সত্য কথাই প্রচার করেছিলেন এবং সেই সত্য ভাষণ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিশ্ব জনমত গঠনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। আমি জানি যে, একমাত্র জ্যোতিঃপাল মহাথের ব্যতীত বাংলাদেশের অন্য কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের উর্দ্ধতন ধর্ম-যাজক বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করে সহযোগিতা করেন নি। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাতৃভূমি উদ্ধারকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর জ্যোতিঃপাল স্বদেশে ফিরে সাংগঠনিক তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করেন। সরকারী, বেসরকারী সকল মহলে তিনি অত্যন্ত সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বৌদ্ধদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ নব জীবন লাভ করেন। সকল প্রকার সংকীর্ণতার উর্দ্ধে থেকে দল-কূল- নিকায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর গৃহী ও ভিক্ষুদের অন্তরঙ্গ সমাবেশে এই প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময় থেকে জ্যোতিঃপাল বেতার ও টেলিভিশনে পবিত্র ত্রিপিকের বাণী প্রচারে এবং বিভিন্ন সভা সম্মেলনে ভাষণ বক্তৃতায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে থাকেন।

এই সংস্থার সভাপতি হিসেবে জ্যোতিঃপাল মহাথেরো জাপান, রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন। এবার ১৯৭৯ সালের জুন মাসে মঙ্গোলিয় এশীয় বৌদ্ধ শান্তি সংস্থার দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব ও পঞ্চম সাধারণ সম্মেলনে তথাগত বুদ্ধের শান্তি-মৈত্রী-অহিংসার বাণী প্রচারে অনন্য সাধারণ অবদান রাখার জন্য জ্যোতিঃপাল মহাথেরকে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ শান্তিপদক ও সনদে ভূষিত করা হয়। এই দুর্লভ সম্মান শুধু জ্যোতিঃপালের জীবনে নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির জীবনে এক অভূতপূর্ব স্মরণীয় ঘটনা। এই মহৎ স্বীকৃতি নিয়ে জ্যোতিঃপালের জীবন আরও জ্যোতিঃময় দীপ্তিতে দীর্ঘায়ু হোক– এটাই তাঁর অগণিত ভক্ত অনুরক্ত নরনারীর অন্তরের অনাবিল অভিলাশ।

জয়তু জ্যোতিঃপাল।

শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল মহাথের অভ্যর্থনা পরিষদ ঃ

সভাপতি ঃ অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার

সহ-সভাপতি ঃ শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ মহাথের, সভাপতি, কুমিল্লা বৌদ্ধ সমিতি।

ঃ জনাব আফছর উদ্দিন মজুমদার, চেয়ারম্যান, বাকই, ইউনিয়ন

ঃ জনাব আবদুল খালেক, চেয়ারম্যান, পশ্চিম গাঁও ইউনিয়ন।

ঃ মোঃ ছিদ্দিক উল্লা (মাষ্টার), চেয়ারম্যান, পেরুল ইউনিয়ন।

সম্পাদক	ঃ	শ্রীযুক্ত ইন্দ্র কুমার সিংহ, সাধারণ সম্পাদক, কুমিল্লা বৌদ্ধ সমিতি।
সহ-সম্পাদক	ঃ	শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত ভিক্ষু, সম্পাদক সম্বোধি সোসাইটি অব বাংলাদেশ, কুমিল্লা।
	ঃ	শ্রীযুক্ত আশুতোষ সিংহ, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘ, কুমিল্লা শাখা।
	ঃ	শৈলেন্দ্র কিশোর সিংহ, সাংগঠনিক সম্পাদক, কুমিল্লা বৌদ্ধ সমিতি।
	ঃ	প্রসেনজিৎ বড়ুয়া (অলক), সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ, কুমিল্লা।
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	শ্রীমৎ আর্যপাল ভিক্ষু, বরইগাঁও বিহার।
	ঃ	শ্রীযুক্ত আশুতোষ সিংহ, বরইগাঁও।
সদস্যবৃন্দ	ঃ	শ্রীযুক্ত লাল মোহন বড়ুয়া, ছোটরা, কুমিল্লা, সহ-সভাপতি, সম্বোধি সোসাইটি অব বাংলাদেশ, কুমিল্লা।
	ঃ	শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি চৌধুরী, উপদেষ্টা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কোটবাড়ী।
	ঃ	শ্রীযুক্ত ক্ষিতীষ চন্দ্র চৌধুরী, এডভোকেট, নোয়াখালী।
	ঃ	জনাব বদরুল আলম (এডভোকেট), বরইগাঁও।
	ঃ	জনাব রফিকুল হক মজুমদার, সহকারী প্রধান শিক্ষক, বরইগাঁও বালিকা বিদ্যালয়।
	ঃ	জনাব মোঃ আবুল হোসেন (ননী ভাই), সদস্য, পেরুল ইউনিয়ন।
	ঃ	শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র সিংহ, দুপচর।
	ঃ	শ্রীযুক্ত কল্যাণ মিত্র বড়ুয়া, জয়নগর।
	ঃ	শ্রীযুক্ত অনিল চন্দ্র সিংহ, সদস্য, বাকই ইউনিয়ন।
	ঃ	শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সিংহ, পাইকপাড়া।
	ঃ	শ্রীযুক্ত সাধন মিত্র সিংহ, বরইগাও।
	ঃ	শ্রীযুক্ত অনঙ্গ কুমার সিংহ, লগ্নসার।
	ঃ	শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র কুমার সিংহ, মজলিশপুর।
	ঃ	জনাব আবদুল বারী মজুমদার, বাকই।
	ঃ	শ্রীযুক্ত যদুনাথ ঘোষ, কেমতলী।
	ঃ	শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র সিংহ, দত্তপুর।
	ঃ	জনাব মোঃ আফছার উদ্দিন মিঞা, বরইগাঁও।

"জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক"।

মুক্তিযুদ্ধে শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের

মোঃ জহিরুল ইসলাম
ডেপুটি কমান্ডার,
কুমিল্লা জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, কুমিল্লা।

কুমিল্লা জেলার লাকসাম থানাধীন বরইগাঁও গ্রামের সন্তান, শ্রী জ্যোতিঃপাল মহাথের। ১৯৭১ সালে ১৯শে এপ্রিল ভারতের কাঠালিয়ায় পৌছেন। অনেক লেখা পড়ার অধিকারী, পাণ্ডিত্যে ভরপুর জীবন তাঁর। সমগ্র দেশে যখন পাক হানাদার বাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ করে চলছে, ঠিক এমনি সময়ে শ্রীজ্যোতিঃপাল মহাথের নীরবে বসে থাকতে পারেননি। বিবেকের তাড়নায় মানবতার সেবায় বয়োঃবৃদ্ধ অবস্থায় সীমান্ত অতিক্রম করে

চলে যান ভারতের মাটিতে। সেখানে গিয়ে স্বগোত্রিয়দের দ্বিধা বিভক্তিকে উপেক্ষা করে ২২শে এপ্রিল '৭১ইং আগরতলায় প্রাচ্য বিদ্যা বিহারের বারান্দায় বহু পত্রিকার সম্পাদকদের সাথে বাঙালী জাতির উপর পাক বাহিনীর পৈশাচিক বর্বরতা, লুণ্ঠন, গৃহ-দাহ, নারী নির্যাতন, ও গণহত্যার মর্মান্তিক কাহিনী জোরালো ভাবে তুলে ধরেন। এর পরের দিন ভারতীয় পত্রিকা সহ পৃথিবীর বহু পত্র পত্রিকা এবং বেতার বাণীতে ফলাও করে তাঁর বক্তব্য প্রচার করা হয়। তাঁর এই বক্তব্য প্রচারিত হওয়ার পর বিশ্বজনমত মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে বিশ্বের ৩৫ জন সাংবাদিক একসাথে আগরতলায় এসে তাঁর মুখ থেকে বাংলাদেশের গণহত্যা লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ, নারী নির্যাতন সহ সকল প্রকার অত্যাচার অবিচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করে বিশ্ব বিবেকের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পান মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে। বিশ্বের সমগ্র বৌদ্ধ দেশগুলি পাক সরকারের উপর অত্যাচার, লুণ্ঠন, গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও অগ্নিসংযোগ বন্ধ করার জন্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভাবে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করেন। এমনিই সময় হঠাৎ করে মুজিব নগর সরকারের আমন্ত্রণে তিনি ৭ই জুলাই ১৯৭১ইং আগরতলা থেকে মুজিব নগর পৌঁছেন। সেখানে গিয়ে যাঁদের দেখা পান তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন হাই কমিশনার জনাব হোসেন আলী, জনাব আবদুল করিম চৌধুরী ও জনাব তাহের উদ্দিন ঠাকুর প্রমুখ।

তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্ব স্বীকৃতি ও জনমত গঠনের লক্ষ্যে নয়াদিল্লীতে ভারতীয় বৌদ্ধ সম্মেলনের চিন্তা করে ১৮ জুলাই ১৯৭১ইং বিরলা মন্দিরে এক সভা আহবান করেন। উক্ত সভায় ব্যাপক উপস্থিতি না হওয়ায় পুনরায় ৮ই আগষ্ট ১৯৭১ইং সর্ব ভারতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন আহবান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল প্রফেসর আর. ডি. ভাণ্ডারের এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করার কথা ছিল ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী সরদার শরণ সিং এর।

তিনি ২১শে জুলাই ১৯৭১ইং তৎকালীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে পাক হানাদার বাহিনীর অত্যাচারের নির্মম চিত্র তুলে ধরেন। ইত্যবসরে মুজিবনগরে অবস্থিত গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের স্বপক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি কল্পে ও স্বীকৃতি লাভের লক্ষ্যে এশিয়ার বিভিন্ন বৌদ্ধ রাষ্ট্রে তাঁকে পাঠানোর যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করায় সর্বভারতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। ৭ই আগষ্ট রোজ শনিবার সকাল ৮ ঘটিকায় নয়া দিল্লী জগজ্যোতি বিহার থেকে জনাব ফকির শাহাবুদ্দিন সহ বের হয়ে বিদেশে বিতরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য, বিভিন্ন প্রকার পুস্তিকা, ফটো ইত্যাদিসহ সকাল ৯-৩০ মিঃ এ বোম্বাই গামী বিমানে করে সেখানে গিয়ে যথারীতি পৌঁছেন। বিকাল ৪ ঘটিকায় সিলোন এয়ারে করে বোম্বাই বিমান বন্দর ত্যাগ করে বিকাল ৫.৩০ মিনিটে সিংহলের বন্দর নায়ক বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। সিংহলে পাঁচদিন অবস্থান করে তিনি সেখানকার নেতৃস্থানীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংগে জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের সার্বিক গণহত্যার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হন। সিংহলে অবস্থান করে ফকির শাহাবুদ্দিন সাহেব ও জ্যোতিঃপাল মহাথের সেখানকার গণপরিষদে কতিপয় মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারী সদস্যের সাথে মিলিত হয়ে বাংলাদেশের পাক বাহিনীর গণহত্যার যথাযথ চিত্র তুলে ধরেন এবং সিংহলের উপর দিয়ে পাক জান্তার কোন বিমান যেন বাংলাদেশের সীমানায় আসতে না পারে সে ব্যাপারে আকুল আবেদন জানালেন। যার ফলশ্রুতিতে তাদের উপস্থিতিতে ৫ (পাঁচ) জন সিংহলী মন্ত্রী যুক্ত স্বাক্ষরে উক্ত প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী মিসেস বন্দর নায়কের নিকট পেশ করলেন। উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে প্রধান মন্ত্রী মিসেস বন্দর নায়েক পাকিস্তানী সকল বিমান বন্দর নায়েক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ বন্ধ করে দিলেন। যার ফলে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী ও সামরিক জান্তা অত্যন্ত বেকায়দায় পড়ে এবং বহির্বিশ্বের সাথে পাক বিমানের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যার ফলে নিয়াজী অরোরার হাতে আত্ম সমর্পণ করলেন ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সন।

এরপর তিনি কলম্বো থেকে ফ্রান্স এয়ারের মাধ্যমে থাইল্যাণ্ড গিয়ে পৌছলেন। সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বাংলাদেশের গণহত্যার কথা বুঝাতে তিনি সক্ষম হলেন। সেখানকার বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাতৃত্ব সংঘের প্রধান কার্যালয় ব্যাংকক সংঘের সেক্রেটারী জেনারেল এ, এম, সংখবাসী, জ্যোতিঃপাল মহাথের এর পক্ষ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন বৌদ্ধ রাষ্ট্রে বাংলাদেশের গণহত্যা, বৌদ্ধ হত্যাসহ বিভিন্ন অত্যাচারের নির্মম কাহিনী প্রচারণা শুরু করলেন। তিনি চীন, জাপান, হংকং, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, মংগলিয়া, রাশিয়ার উলানউদে, মস্কো, নেপাল, ভুটান, সিকীম সহ প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রচার করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করলেন।

অবশেষে তিনি সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে গিয়ে পৌছলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন অনেক পূর্বেই বাংলাদেশের পক্ষে জাপানে কাজ করার জন্য "বাংলাদেশ লিবারেশন কমিটি" নামে একটি সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত সংস্থার চেয়ারম্যান হলেন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ টি নারা এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন মোঃ জালাল আহম্মদ নামে একজন বাঙালী ভদ্রলোক। উক্ত দুই জনের সাহায্যে জাপানের বিভিন্ন সংস্থা, বৌদ্ধ ভিক্ষু, রাজনৈতিক ব্যক্তিগণকে বাংলাদেশের সার্বিক অত্যাচারের কাহিনী বুঝাতে সক্ষম হন। কোমোজেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ য়াসুযাকি নারা তাঁকে সার্বিক সাহায্য করেন। তাছাড়া আরো যারা এ ব্যাপারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন ত্যারা হলেন জাপান- আফ্রো- এশিয়া সংহতি কমিটির ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য মিঃ ফমিকুবো, টোকিও মহিলা বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ কে, এ কাশী ওয়াদী, নিচি ইন্দো সূর্যোদয় সমিতির সভাপতি মিঃ কোজিও কামাঠে এবং এটোম ও হাইড্রোজেন বোমার বিরুদ্ধে জাপান কাউন্সিলের পরিচালক ভিক্ষু গ্যাসৎসো সাতো। এই ভাবে টোকিওতে ১০ দিন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গড়ে তুলে ২২শে আগষ্ট হংকং এসে পৌছেন এবং হংকং থেকে ঐ দিনই নয়া দিল্লী নির্দিষ্ট গন্তব্যে এসে পৌছেন।

এমনি একজন সংগঠক জ্যোতিঃপাল মহাথের আজ কেমন আছেন? জ্যোতির ন্যায় আলো ছড়িয়ে যে মানুষটি বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, দাতা, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক, অনাথের আশ্রয় দাতা, সম্বলহীনের ভরসা বৌদ্ধ ভিক্ষু, জীবনের লোভ লালসা, আরাম আয়েশ সংসার ত্যাগ করে যে সাধক মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে স্বগোত্রীয়দের চরম বিরোধিতাকে অতিক্রম করে ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে সে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে মানবতার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে দেশ থেকে দেশান্তরে যে ভূমিকা পালন করেছেন, সে মানুষটি আজ জীবন সায়াহ্নে কি পেলেন? এই স্বাধীন দেশে কেউ কি খবর নিয়েছেন? ৮৭ বৎসর বয়সে চট্টলার নিঝুম পাহাড়ে বসে বসে হয়তো ভাবছে 'হে স্বাধীনতা তুমি কতো নিষ্ঠুর'। আজ বীর সন্তানদের গায়ের ঘামে, কঠোর শ্রমে, তাজা রক্ত, আর ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত লাল-সবুজ পতাকা পত পত করে উড়ছে বিশ্বের দরবারে। অথচ সেই সূর্য সন্তানদের আজ কি করুণ অবস্থা। কেউ পাহাড়ের চুড়ায়, কেউ পথে প্রান্তরে, কেউ হাটে, মাঠে, ঘাটে রিকশা চালায়, গতর খাটে,কেউ জীবন যুদ্ধে ধুকে ধুমে মরছে। যে যোদ্ধা হার মানেনি হায়নাদের অত্যাধুনিক অস্ত্রের কাছে, সেই যোদ্ধা, সংগঠক, গায়ক, বাদক, লেখক, শ্রমিক, কৃষক, কামার, কুমার ও সুরকার আজ জীবন যুদ্ধে দিশেহারা। স্বদেশী স্বগোত্রীয় নর পিশাচদের কাছে আজ তাঁরা করুণার পাত্র। হে বিবেক, সম্মান দাও আজ তোমার শ্রেষ্ঠ সন্তানদেরকে, তবেই সার্থক হবে এ স্বাধীনতা।

এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বাংলার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে উচ্চ পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সংগঠক রূপে সহযোগিতা করেছেন কুমিল্লা নিবাসী মাননীয় জ্যোতিঃপাল মহাথের আর লাকসাম সেক্টরে গইয়ার ডাঙ্গা ময়দানে হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখে সমরে মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে শহীদ হয়েছেন, জীবন দিয়েছেন মনোরঞ্জন সিংহ (দত্তপুর, লাকসাম) তার মা প্রথম বাংলাদেশ সরকার থেকে সামান্য মাসিক ভাতা পেয়ে দুঃখ কষ্টে দিন অতিবাহিত করছেন।

ঢাকা ধর্মরাজিক মহাবিহারে 'উপসনাগার' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও জ্যোতিঃপাল মহাথেরর একান্ত সাক্ষাৎকারের দুর্লভ দু'টি ছবি প্রদান করছেন পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের। প্রধানমন্ত্রীর পিছনে দণ্ডায়মান ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোঃ হানিফ। আসনে উপবিষ্ট সভাপতি শুদ্ধানন্দ মহাথের, পাশে দণ্ডায়মান সাংবাদিক বিমলেন্দু বড়ুয়া ও ডঃ বিকিরণ প্রসাদ বড়ুয়া।

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১. কর্মতত্ত্ব
২. পুদ্গল প্রজ্ঞপ্তি (চ.বি. পালি বিভাগে পাঠ্য)
৩. মালয়েশিয়া ভ্রমণ কাহিনী
৪. বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রামে
৫. বোধি চর্য্যাবতার (চ.বি. পালি বিভাগে আংশিক পাঠ্য)
৬. সাধনার অন্তরায়
৭. বুদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা
৮. সৌম্য সাম্যই শান্তির কারণ
৯. প্রজ্ঞাভূমি নির্দেশ (চ.বি. পালি বিভাগে পাঠ্য)
১০. ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের উত্থান পতন
১১. ব্রহ্মবিহার
১২. চর্য্যাপদ (চ.বি. বাংলা বিভাগে পাঠ্য)
১৩. বুদ্ধের জীবন ও বাণী
১৪. গুরুদেব গুণালংকার মহাস্থবিরের জীবনী
১৫. রবীন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি